উপন্যাস

হৃদয়ে প্রবাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১-২. ওই ছবিটা কার..2
৩-৪. হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে..3 0
৫-৬. তপন সেজেগুজে হোটেলে...5 7
৭-৮. হোটেলের দরজা সারারাত খোলা...............................8 8
৯-১০. তপনের সঙ্গে কলকাতা শহরে..................................1 1 1
১১-১২. আমেদপুর স্টেশনে...1 3 9

১-২. ওই ছবিটা কার

ওই ছবিটা কার?

আমার বাবার।

না, ওই পাশে দাঁড়ানো লোকটি?

দ্যাট জেন্টলম্যান কিল্ড মাই ফাদার–

তপন চুপ করে ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। যেন ঘরের আলো কম, তপন এগিয়ে এল ছবিটার আরও কাছে। অনেক কালের পুরোনো ছবি, রং জ্বলে লালচে হয়ে এসেছে, তবু স্পষ্ট চেনা যায়। কত দূরে, এই পৃথিবীর কোথায় যেন বাংলাদেশ বলে এই ভূখন্ড আছে, তার একটা ছোট্ট গ্রাম, সেই গ্রামের স্কুল বাড়ির সামনে একজন বিশাল চেহারার ইংরেজ, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন রোগা ছোটোখাটো চেহারার বাঙালি যুবা। ইংরেজটির হাতে লাল রিবন বাঁধা কয়েকটি বই ও মুখে বদান্যতার হাসি, বাঙালি যুবকটি হাতজোড় করে নমস্কার করে আছে। অন্তত তিরিশ বছর আগে তোলা ছবি, তবু স্পষ্ট এখনও, এখনও দু-জনের মুখের হাসি সম্পূর্ণ ম্লান হয়নি।

তপন দীর্ঘশ্বাস ফেলল না, কিন্তু পা দুটো ভারী হয়ে এল। এক ধরনের বিশ্রী পেট ব্যথা শুরু হল। কখনো বেশি মন খারাপ হলেই তপনের এইরকম চিনচিনে পেট ব্যথা আরম্ভ হয়, বোধ হয় আলসারের সূত্রপাত। প্রথমবার ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল, নিউইয়র্কে থাকবার সময়। ডাক্তার বলেছিল, কখনো পেট খালি রাখবে না, পকেটে বিস্কিট রাখবে সবসময়-মাঝে মাঝে একটা-দুটো খাবে। আর, কখনো বুক খালি করে মনখারাপের দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। মন খারাপ থেকেই পেট খারাপ শুরু হয়।

তপন তো মন খারাপ করতে চায়নি, যেন ডাক্তারের নির্দেশেই সে সবসময় আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। আজ সন্ধ্যেটাও তো হইহল্লার মধ্যে কাটাবে বলেই সে সেজেগুজে এসেছিল। কিন্তু লণ্ডনের এই স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া আর বিশ্রী কুয়াশা-তার ওপর, উৎসবের ঠিক আগের মুহূর্তে এইরকম অকল্পনীয় ছবির মুখোমুখি হলে কার-না মন খারাপ হয়!

তপন পকেট থেকে হাত বার করে ছবিটার ফ্রেমে আলতোভাবে আঙুল বোলাতে লাগল। কালো রঙের ভারী কাঠের ফ্রেম। ফ্রেমের গায়ে সোনার জলে কী যেন লেখা ছিল, এখন আর পড়া যায় না। তপনের মনে হল, এ ছবিটা যেন তার দেখার জন্যই এতকাল এখানে আছে। তপন ছাড়া এ ছবি আর কেই-বা দেখবে!

অ্যালিস বলল, তুমি ওভার কোটটা খুললে না? ইস, জুতোও তো একদম ভিজে গেছে। তুমি হিটারে পা সেঁকে নাও বরং

তপন আস্তে আস্তে কোট খুলল, জুতো খুলল, ডিভানের ওপর বসে মোজাপরা পা-দুটো তুলে দিল হিটারের পাশে। তারপর ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, অ্যালিস, তোমার বাবা বাংলাদেশে ছিলেন? তুমি আগে বলোনি তো!

অ্যালিস টেবিল গোছাতে ভারি ব্যস্ত। বলল, বলিনি বুঝি? হ্যাঁ, আমার বাবা বাংলাদেশে ছিলেন। লং লং টাইম এগো-

উপহারের মোড়কটা তপন আগেই টেবিলের ওপর রেখেছিল। সেটা খুলে শ্যাম্পেনের বোতলটা দেখতে পেয়ে অ্যালিসের চোখ খুশিতে ঝিলমিল করে উঠল। কলস্বরে বলল, শ্যাম্পেন? গস, দিস ইজ ড্যাম এক্সপেন্সিভ! আর যু আ মহারাজ অর সামথিং?

অ্যালিস, তোমার বাবা বাংলাদেশে কোন স্থানে ছিলেন? পূর্ববঙ্গে?

ইয়েস, ডাক্কা, তুমি শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে জানো তো?

শ্যাম্পেনের বোতল খোলা আর শক্ত কী?

তুমি জান কি না বলো না! আগে খুলেছ কখনো?

এসব ব্যাপারে তপন একটুতেই চটে যায়। নারী-পুরুষ গ্রাহ্য করে না। বলল, অ্যালিস, তুমি জীবনে ক-টা শ্যাম্পেনের বোতল দেখেছ? এই পাঁচ বছরে তার চেয়ে ঢের বেশি শ্যাম্পেন আমি খেয়েছি। আই হোপ যু হ্যাভ প্রপার গ্লাসেস?

ডোন্ট বি ফাসি, টপন। ওপন ইট।

তপন এক হাতে শ্যাম্পেনের বোতলটা নিয়ে অন্য হাতের বুড়ো আঙুলে নিপুণভাবে কর্কের ওপর চাপ দিল। একটুক্ষণের মধ্যেই পম করে শব্দ হয়ে হু-স-করে ফেনা বেরিয়ে এল, তপন তার এক ফোঁটাও মাটিতে পড়তে না দিয়ে বোতলটা ঠক করে টেবিলে রাখল। টক-মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল ঘর। তপন আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা কোন সময়ে বাংলাদেশে ছিলেন?

অ্যালিস চঞ্চলা গতিতে কাবার্ড থেকে গ্লাস আনতে গেছে, দু-এক মুহূর্তের মধ্যে গ্লাস হাতে ফিরে এসে বলল, আজ আমরা ফিলম দেখতে যাব না, বাইরে বেরোব না, শুধু তুমি আর আমি এখানে

অ্যালিস, তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

অ্যালিস চমকে উঠল, তার উচ্ছল ভঙ্গিমা হঠাৎ আহত হল। বিমূঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী কথা, টপন?

এই-যে আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার বাবা কোন সময়ে বাংলাদেশে ছিলেন? বললে তোমার বয়স বুঝে ফেলব ভাবছ? কিন্তু আমি তো জানিই তোমার বয়েস তিরিশের কম নয়।

অ্যালিস তপনের স্বভাব এই ক-দিনেই খানিকটা জেনে গেছে। তবু বয়েসের খোঁটা শুনে অপমানিত না হয়ে পারল না। অভিমানী শিশুর মতন বলল, বয়েস লুকোব কেন? আমার বয়েস তো সত্যই তিরিশ, তোমাকে আগেই বলেছি। তুমি এত রুড হচ্ছো কেন টপন? আমি ভেবেছিলাম, আজ সন্ধ্যে বেলাটা বয়েস কিংবা পুরোনো ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার বদলে আরও অন্য ভালো ভালো বিষয় পাওয়া যাবে। আমার বাবা বাংলাদেশে ছিলেন নাইনটিন থারটি সেভেন, থারটি এইট-এ-জাস্ট বিফোর দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়র স্টার্টেড, আমার তখন চার-পাঁচ বছর বয়স।

তুমি তখন কোথায় ছিলে? এখানে না বাংলাদেশে?

আমি বাবার কাছেই থাকতুম, মা তখনও

তোমার বাংলাদেশের কথা মনে আছে একটুও?

স্বপ্নের মতন একটু-একটু, চারদিকে কী গাঢ় সবুজ, কী বিশাল সেখানকার নদীগুলো, পডমা

অ্যালিস, তুমি জানো, আমিও বাঙালি?

অব কোর্স আই নিউ–তুমিই তো বলেছ

বাংলাদেশের লোক দেখলে কিংবা বাংলাদেশের কথা শুনলে তোমার রাগ হয় না?

কেন, রাগ হবে কেন? অমন সুন্দর দেশ

কারণ, বাংলাদেশের লোকই তো তোমার বাবাকে খুন করেছিল।

অ্যালিস হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, প্লিজ, প্লিজ, ডোন্ট– তপন দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী, কী হল?

প্লিজ টপন, ওসব কথা তুলো না। আমি ওসব কথা একদম ভাবতে চাই না কখনো। আমরা দুজনে বন্ধু! তুমি আজ আমাকে এখনও একবারও আদর করোনি। কাম

তপন অ্যালিসের চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর নিরাসক্তের মতন এগিয়ে এল। সম্পূর্ণ শরীর না-স্পর্শ করে শুধু মুখ এগিয়ে আলতোভাবে অ্যালিসের ওষ্ঠে একটা চুম্বন দিল। অ্যালিস নিজেই ওর উত্তাপময় শরীরটা চেপে ধরল তপনের গায়ে, দু হাতে গলা জড়িয়ে একটা প্রগাঢ় চুমুতে আবদ্ধ হয়ে রইল কয়েক মিনিট। শেষ হলে, তপন রুমাল দিয়ে ঠোঁট থেকে লিপস্টিকের দাগ ও গন্ধ মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালার জন্য টেবিলের কাছে সরে গিয়ে অ্যালিস বলল, কুয়াশা সরে গেছে, দেখো এখন কী সুন্দর, ইটস বিউটিফুল আউটসাইড। টপন, এসো জানলার কাছে

গ্লাস হাতে তপন জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। অ্যালিস ওর দেহে ঠেস দিয়ে নিজেকে আলগা করে দিল। প্রায় নিজের অজান্তেই তপন একটা হাত রাখল অ্যালিসের কাঁধে, তার নাকের কাছেই অ্যালিসের সোনালি চুল, আনমনে তার মিষ্টি গন্ধ নিয়ে তপন উদাসীনভাবে তাকাল বাইরে। কুয়াশা কেটে গেছে কিন্তু ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। পথে মানুষ দেখা যায় না, শুধু চলন্ত ছাতা-টুপি আর ওভারকোট। হ্যাম্পস্টেড-এর এ অঞ্চলটা ঘিঞ্জি ধরনের। রাস্তায় মেয়ের থেকে বুড়ি বেশি, প্যারামবুলেটর ঠেলছে ন্যানিরা, নোংরা লণ্ডন, বিষণ্ণ লণ্ডন। পুরুষদের অধিকাংশই কালো সুট পরা, যেন সবাই কোনো শোক মিছিলে চলেছে।

সময় এবং আয়ু কীরকম লুকোচুরি খেলে! লণ্ডনের বান্ধবীর ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তপনের অকস্মাৎ মনে পড়ল তার ষোলো বছর বয়সের একটা দিনের কথা। সিউড়িতে, কাকার বাড়িতে-এইরকমই শুয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। তখন তার বিষম অসুখ, ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা অনেকখানি ফুলে বিষম যন্ত্রণা। কাকা নিজে ডাক্তার তবু অসুখ ধরতে পারেননি, দিন-রাত ব্যথায় চেঁচাত তপন, ঘুমের ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দিয়ে রাখা হত তাকে। এরই মধ্যে কোনো-এক আচ্ছন্ন অবস্থায় তপন অস্পষ্টভাবে শুনেছিল- কাকা

আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে তার সম্বন্ধে আলোচনা করছে। সেই ডাক্তারটি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তপনের ক্যানসার হয়েছে, তপনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। তপন জানত, ক্যানসার হলে মানুষ আর বাঁচে না। সেইদিন বিকেলে ঘুম ভাঙার পর, তপন আর পায়ের যন্ত্রণায় চেঁচায়নি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, কাছেই একটা ছোটো ডোবাপুকুর একদল লোক সেখানে নেমে কচুরিপানা পরিষ্কার করছে, চেঁচামেচি করছে দু-তিনটে ছেলে, একটা কুকুর চুপচাপ বসে, পাকুড়গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মা কথা বলছেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজের সঙ্গে–যেন সব মিলিয়ে একটা আঁকা দৃশ্য। নীরব তপনের চোখে জল এসে গিয়েছিল–সে আর বাঁচবে না, এইসব কিছু ছেড়ে যেতে হবে? সব? সেদিন তপনের ক্ষীণতম কল্পনাতেও ছিল না–একদিন সে সত্যিই এসব জায়গা ছেড়ে যাবে, দাঁড়াবে পৃথিবীর নানান দেশের জানলায়, প্যারিস, নিউইয়র্ক, শিকাগো, রোম, এমনকী বিলেতেও বিলেতের জানলায় কোনো জলজ্যান্ত ইংরেজ ললনার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবে।

অ্যালিস বলল, দেখো, আজ আমাদের জন্যই আবহাওয়াটা এমন সুন্দর হয়ে গেল। কুয়াশা কেটে গেছে।

তপন বলল, কোথায় সুন্দর? বিচ্ছিরি তোমাদের লণ্ডন। কুয়াশা কাটতে-না-কাটতেই বৃষ্টি! এ-সময় নিউইয়র্ক কিংবা বোস্টনে–মেপলগাছের পাতাগুলো টুকটুকে লাল হয়ে এসেছে, ফল এখন, গ্লোরিয়াস ফল, সবার মনে ফুর্তি, আর তোমাদের

অ্যালিস সদ্য শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়েছে, মুখভরা সেই অবস্থায় হাসি চাপার চেষ্টা করে বলল, ইস, খুব আমেরিকান হয়ে গেছো! ক-বছর তো মোটে ছিলে!

পাঁচ বছর তিন মাস! একটা দেশকে ভালো লাগবার পক্ষে যথেষ্ট।

তা হোক, নিজের দেশের আবহাওয়াই সবার ভালো লাগে। তোমার বাংলাদেশের– বলতে বলতে অ্যালিস থেমে গেল। আবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গ যেন সে তুলতে চায়নি। তপনের মুখটা অন্য দিকে ফেরানো ছিল, বাংলাদেশের কথা শুনেই চোখের পলক ফেরাবার আগে

দু-এক মুহূর্ত বাংলাদেশে ঘুরে এল। সাড়ে পাঁচ বছর সে দেশ দেখিনি, তবু কিছুই বদলায়নি, আমি জানি, মনে হল তপনের, আমি বদলে গেছি, তা বলে দেশ বদলাবে?

তপন বলল, বাংলাদেশের আবহাওয়াও তোমাদের লণ্ডনের চেয়ে ঢের ভালো। সেখানকার রোদ-বৃষ্টি-শীত সবগুলোই আলাদা আর স্পষ্ট, তোমাদের মতন এমন জড়াজড়ি করে নেই!

অ্যালিস তর্কে যেতে চায় না। সে স্মৃতিমন্থনের সুরে বলল, বাংলাদেশ–আমার একটু একটু মনে আছে–ব্রাইট সান, আমাদের বাংলোর পাশে একটা পুকুর ছিল, হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি, টরেনশিয়াল রেইন–

অ্যালিস, তোমার বাবা কেন খুন হয়েছিলেন?

প্লিজ টপন আজ ওকথা থাক। আজকের চমৎকার সন্ধ্যে বেলাটা ওসব পুরোনো কথা মনে করে নষ্ট করতে চাই না।

বলো না, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

কী আর শুনবে বল? নতুনত্ব কিছু নেই, পলিটিক্যাল মার্ডার। তোমাদের দেশ তখন পরাধীন ছিল–আমার বাবা ব্রিটিশ–এ-রকম তো সব দেশেই হয়

অ্যালিস, তুমি এত শান্তভাবে কী করে কথা বলতে পারছ? তোমার নিজের বাবা খুন হয়েছিলেন একজন ভারতীয়ের হাতে–আমাকে ভারতীয় জেনেও তুমি কী করে সহ্য করছ?

অ্যালিস অপলকভাবে তপনের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি ভারতীয় কিংবা ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান–এইভাবে মানুষকে দেখি না। আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই শুধু দেখি!

তপন অ্যালিসের কথায় খুব গুরুত্ব দিল না। হালকাভাবে বলল, বাঃ, আমি একটা কালো রঙের লোক-আমার সঙ্গে তুমি এত মিশছ-তোমার নিন্দে হয়ে যাবে।

অ্যালিস ছোট্ট মুঠো তুলে তপনকে একটা কিল মেরে বলল, আবার বাজে বকছ! তা ছাড়া তুমি মোটেই কালো নও, তোমার গায়ের রং ব্রাউন-ঠিক পাকা জলপাইয়ের মতন-এই রংটাই আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার বলো।

কী বলব?

তোমার বাবা কী করে খুন হলেন?

তুমি আবার ওই কথা শুনতে চাইছ? কেন?

স্রেফ কৌতূহল!

বিশ্বাস করো টপন, সেসব কথা আমার মনে নেই। আমি তখন ছোটো, সে-বয়সের কথা কি কারুর মনে থাকে? শুধু মা-র মুখে যেটুকু শুনেছিলুম

সেটাই বলো

প্লিজ, প্লিজ, ওকথা আমি মনে করতে চাই না- কতবার তোমাকে একথা বলব? আজ আমার জন্মদিন-আজআমার আনন্দ করার কথা, আজ ছেলেবেলার কথা ভেবে মন খারাপ করার কথা তো নয়!

জন্মদিনেই তো ছেলেবেলার কথা ভাবতে বেশি ভালো লাগে।

কিন্তু টপন, আমার ছেলেবেলাটা যে বড়ো দুঃখে কেটেছে। একটাও সুন্দর-মধুর স্মৃতি নেই। বাবা হঠাৎ খুন হবার পর আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। হিজ ম্যাজেস্টিস

গাভমেন্ট অবশ্য মা-কে একটা পেনশন দিত, কিন্তু দেশে ফিরে আসার দু-বছরের মধ্যেই মা আবার বিয়ে করল। মা আমাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি, মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতাই নেই মা-র; মা শুধু নিজেকে ভালোবাসত-যাই হোক, আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী-আই হেটেড টু কল হিম ফাদার-আমার বাবার তুলনায় সে ছিল নেহাৎই অতি বাজে লোক-মা কী দেখে তাকে বিয়ে করেছিল কী জানি-সে আমার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করত না, সে আমায় ঘৃণা করত। আমার ধারণা হয়েছিল, সে বোধ হয় আমাকে মেরে ফেলতে চায়। মা আমাকে তখন স্কটল্যাণ্ডে এক মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আমার সেই মাসি- তাকে ডাইনি বললেও কম বলা হয়, আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাথরুমে আটকে রেখে শাস্তি দিত, আমাকে খেতে দিত না–মা আর টাকা পাঠাত না–পৃথিবীতে আমাকে ভালোবাসার কেউ ছিল না–আমার ছেলেবেলাটা বড়ো দুঃখে কেটেছে তপন–।

তপন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। নীরসভাবে বলল, ছেলেবেলা অনেকেরই দুঃখে কাটে। আমি তোমার ছেলেবেলার সব গল্প শুনতে চাইনি ডার্লিং–আমি শুধু তোমার বাবার মৃত্যুর ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলাম।

অ্যালিস বিমূঢ়ভাবে তপনের দিকে তাকাল। সিগারেটের ধোঁয়ার কুন্ডলির মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আছে তপনের আসীন ঋজু শরীর। প্রায় ছ-ফুটের কাছাকাছি লম্বা, ধারালো ঝকঝকে শরীর তপনের, মনে হয় সারাগায়ে এক ছিটেও চর্বি নেই। খেলাচ্ছলে ফুঁ দিয়ে সে ধোঁয়া সরাবার চেষ্টা করছে, ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যায় তার নির্লিপ্ত মুখ, যেন ছেলেবেলার দুঃখের কাহিনিকে সে ওইরকম ফুঁ দিয়ে ওড়াল।

অ্যালিস দম-চাপা গলায় শুধু ডাকল, টপন–

তপন অ্যালিসের মুখের দিকে তবুও তাকাল না, ওর কণ্ঠস্বরের বদল লক্ষ করল না, আপন মনেই বলল, তোমার এদেশের ছেলেবেলার গল্প নয়, তোমার বাংলাদেশের ছেলেবেলার গল্প বলো–

চোখের জল লুকোবার জন্য অ্যালিস মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুজল। একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, টপন, তোমার এই রুক্ষতা, তোমার এই পৌরুষের জন্যই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে। কিন্তু আজ আমাকে এত বেশি কষ্ট দিচ্ছ কেন? কেন আমার দিকে তাকাচ্ছ না? আমার আজকের পোশাক তোমার পছন্দ হয়নি? আমাকে আগলি দেখাচ্ছে? তুমি আজ একবারও আমার পোশাক সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করনি। আমার ঘরটা তোমার ভালো লাগছে না? অন্য দিনে তুমি আমাকে কত আদর করো–আজ তোমার মুখ এত শুকনো কেন? কেন? বলো, বলো, আই ফিল লাইক ক্রায়িং–

তপনের মন যেন বহুদূরে চলে গিয়েছিল, কোনো নির্দিষ্ট দেশে নয়–সম্পূর্ণ শূন্যতার মধ্যে। আবার ফিরে এল অ্যালিসের ঘরে, তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে উঠল। পর মুহূর্তে হাসিমুখে তাকাল অ্যালিসের দিকে। বিদেশে এসে মুহুর্মুহু অভিব্যক্তি বদলানো সে ভালো রপ্ত করে নিয়েছে। একটু আগে তার ভ্রূকুঞ্চিত মুখ ছিল–এখন সেটা অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত। দু-হাত বাড়িয়ে অ্যালিসকে বলল, কাম অন ডার্লিং, তুমি সত্যিই রেগে গেছ নাকি? যাঃ–অ্যালিস কোনো সাড়া দিল না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শরীর মোচড়াতে থাকে। অ্যালিস কাঁদছে সত্যি সত্যিই।

তপন নিজেই এগিয়ে গিয়ে অ্যালিসের হালকা শরীরটা বুকের মধ্যে টেনে দিল, ওর মুখখানি উঁচু করে তুলে চুমুতে চুমুতে ওর চোখের জল পান করতে লাগল। সাগরপারের মেয়েদের চোখের জল একটু কম নোনতা, তপন বহুবার দেখেছে। পাতলা, বেশি জল মেশানো অশ্রু না হলে ওরা এত ঘন ঘন কাঁদতে পারে কী করে? তপন নরমভাবে অ্যালিসকে আলিঙ্গন করে থাকে–উঁচু স্তন জোড়ার ফাঁকে গরম নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, যু আর আ সুইট লিটল থিং! কিউট! উম-উম–তোমার পোশাকটা সত্যিই খুব সুন্দর, আমার আগেই বলা উচিত ছিল, সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে–নতুন কিনলে বুঝি? সে ত্রে শিক, নেস পা!

তপন তার সামান্য ফরাসি জ্ঞানও দেখাতে শুরু করে। অ্যালিস এই সামান্য আদরেই মুগ্ধ হয়ে যায়, তপনের গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে থেকে বলে, সত্যি তোমার পছন্দ হয়েছে? রিজেন্ট থেকে কিনলুম, এই প্রথম ওখানকার দোকান থেকে

আজ কী খাবার তৈরি করেছ?

তোমার খিদে পেয়েছে বুঝি?

পাবে না! প্রায় সাতটা বাজে, আর কখন ডিনার খাব? কী কী রেঁধেছ বলো!

তুমি স্টেক ভালোবাস, তোমার জন্য ভালো সারলয়েন স্টেক এনেছি-মিডিয়াম রোস্ট, চিকেন-ওনিয়ন সুপ আছে, তুমি বাঙালি তো-তাই ভাতও বেঁধেছি, অ্যাসপারাগাস, স্ট্রবেরি আইসক্রিম আছে ডেসার্ট আর হোয়াইট ওয়াইন-বোর্দো, নাইনটিন ফিফটি সিক্স।

বাঃ চমৎকার, শুনেই খিদে চনচন করছে। আমি বাঙালি ছিলাম অনেককাল আগে এখন আর ভাত-টাত ভালোবাসি না, মাংসই খাব-

সত্যি তুমি ভাত ভালোবাস না?

একদম না।

কেন, আমেরিকাতেও বুঝি চাল পাওয়া যায় না?

খুব ভালো চাল পাওয়া যায়। আমেরিকার চাল খেয়েই তো ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচল! সেজন্য না, আমি তো আর বাংলাদেশে কোনোদিন ফিরে যাব না-তাই বাঙালি স্বভাবগুলো আমি আস্তে আস্তে ঘুচিয়ে ফেলছি।

ফিরে যাবে না? এই তো কয়েকদিন পরেই যাবে বলছিলে যে?

সে তো মাত্র দু-তিন সপ্তাহের জন্য। বাংলাদেশে আর থাকব না-আমেরিকাতেই আবার ফিরে আসব। ওখানেই সেটল করব। দাও দাও খেতে দাও

তোমার আর তর সইছে না দেখছি! শ্যাম্পেনটা শেষ করো। এত খিদে পেয়ে গেল এর মধ্যে!

হ্যাঁ, দাও, খেতে খেতে তোমার বাবার মৃত্যুর কাহিনিটা শুনব।

আবার? কেন তুমি বার বার ওই কথা তুলছো! তুমি তো বাংলাদেশে আর যাবে না, তাহলে বাংলাদেশের ওই সব পুরোনো ঘটনা জানার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?

বা:, এটা তো খুব স্বাভাবিক। তোমাকে আমি চিনতাম না আগে, লণ্ডনে এসে প্রথম পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল-আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো শর্ত নেই। কিন্তু তোমার ঘরে এসে যদি হঠাৎ একটা ছবিতে দেখি-তোমার বাবা আর একজন ভারতীয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর সেই ভারতীয়টিই তোমার বাবাকে খুন করেছে-তা হলে পুরো ঘটনাটা শুনতে ইচ্ছে হবে না?

তুমি ওই লোকটাকে চেনো?

ওকে আমি চিনব? কী করে তুমি আশা কর যে, যেকোনো বাঙালিকেই আমি চিনব?

কিন্তু টপন ডিয়ার, আজ সন্ধ্যে বেলা আমাদের দেশ কিংবা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার কথা নয়। ওসব আমি ভালো বুঝিও না। আমি শুধু জানি, আমরা দুজনে বন্ধু

আমরা নিশ্চয়ই বন্ধু, কিন্তু বন্ধু কি বন্ধুর ছেলেবেলার ঘটনা জানতে চায় না? তুমি যতই আপত্তি করছ, ততই আমার কৌতূহল বাড়ছে।

আচ্ছা, তাহলে চুপটি করে বোসো। আমি খাবার টেবিলটা আগে সাজিয়ে নিই।

দেশ ছাড়ার আগে মা বলেছিলেন, তপু, আর-যাই করিস গো-মাংস খাসনি কক্ষনো। শরীরের যত্ন করিস। বিদেশে আসার এক বছরের মধ্যেই মা মারা যান। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তপু মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি মেনে চলেছে। মা মারা যাবার পর আর সেকথা মানার দায়িত্ব নেই। এখন তার মনে হয়, পশ্চিম দেশে এসে যে গোরু খায় না, সে নিজেই একটা গোরু। আজ গোরুর শরীরের সবচেয়ে ভালো অংশ দিয়ে বানানো স্টেক তপনের প্রিয় খাদ্য। এক হিসেবে আজ তপন মায়ের কথা রেখেছে, শরীরের যত্ন নিচ্ছে।

কিন্তু স্টেক তো আমেরিকার মতন বিলেতে এত সস্তা নয়, আহা অ্যালিস নিশ্চয়ই ওর কষ্টে জমানো পয়সা খরচ করে কিনেছে। ফরাসি ওয়াইন কিনেছে-তারও দাম কম নয়। স্টোভে খাবারগুলো গরম করছে অ্যালিস, তপন সেইদিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। হালকা সবুজ রঙের গাউন অ্যালিসের, তার সোনালি চুলের সঙ্গে সত্যিই মানিয়েছে। পাতলা শরীরের গড়ন, কোমরটা এত সরু যেন এক মুঠোতে ধরা যায়, বড়ো বড়ো টানা টানা চোখ -চোখ দুটো দেখলে যেন কার কথা মনে পড়ে-তপন কিছুতেই মনে করতে পারল না। নাচের ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করছে অ্যালিস-একবার কাবার্ডের কাছে, একবার স্টোভে, মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাস্য দিচ্ছে।

সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছে তপনের। খিদের মুখেই ও একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে তপন লক্ষ করল, ওর হাত কাঁপছে। পর পর তিনটে কাঠি নিভে গেল- এসব ঘরে তো পাখা নেই যে দেশলাইয়ের কাঠি নিববে। হাত কাঁপছে কেন? তপন নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। এটা তো ভালো লক্ষণ নয়। যদিও অ্যালিস দেখতে পায়নি, তবু তপন বিব্রত বোধ করল। পেটের ব্যথা কমে গিয়ে এখন হাত কাঁপছে। পেটের ব্যথা বাইরে থেকে দেখা যায় না, হাত কাঁপাও অ্যালিস লক্ষ করেনি, তবু তপন ব্যস্ত হয়ে ভাবল, এটা এক্ষুনি চাপা দেওয়া দরকার। খেতে বসে ছুরি-কাঁটা ধরে যদি তার হাত কাঁপে! তপন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, অ্যালিস, তোমার কাছে কোনো হার্ড ড্রিঙ্কস আছে? হুইস্কি কিংবা রাম?

অ্যালিস ঘুরে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, আবার ওসবে কী হবে? এখনও তো শ্যাম্পেন আছে।

শ্যাম্পেনে আর শানাচ্ছে না, একটু কড়া কিছু খেতে চাই।

হাউ ডু য়ু এক্সপেক্ট সাচ স্টাফ ইন আ গার্লস রুম?

ঠিক আছে, তুমি রান্নাটা শেষ করে ফেলো, আমি ততক্ষণে বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসছি।

এখন, এই বৃষ্টিতে তুমি আবার বাইরে যাবে?

তাতে কী হয়েছে? এক্ষুনি চলে আসব।

ওয়েট আ মিনিট। তোমাকে যেতে হবে না, আমার কাছে আধ বোতল ব্র্যাণ্ডি আছে, তুমি তো ব্র্যাণ্ডিও ভালোবাস–সেদিন দেখেছি।

ঠিক আছে, ব্র্যাণ্ডিতেও চলবে।

অ্যালিস নিখুঁতভাবে টেবিল সাজিয়েছে। বাংলাদেশের এক অতি-অখ্যাত গরিব পরিবারের ছেলে তপন, আজকাল সে এসব ব্যাপার খুব তারিফ করতে পারে। খাওয়ার টেবিল ভালো করে সাজানো নয় দেখলে বিরক্ত হয়, অথচ তাদের বংশে কেউ আগে কোনোদিনই টেবিলে বসেই খায়নি। অ্যালিস বেশ পরিপাটি করে সাজাতে জানে। কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা ন্যাপকিন ফুলের মতন সাজিয়ে রেখেছে গ্লাসে। কাঁটা চামচগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। প্লেটে সাজানো স্যালাডগুলো যেন কাশ্মীরি শালের ডিজাইন। তপন কেতাদুরস্ত ভাবে প্রত্যেকটা খাবারের প্রশংসা করল, তারপর আইসক্রিমে চামচ ডুবিয়ে বলল, এবার বলো–

অ্যালিসের মুখখানা আবার করুণ হয়ে এল। যেন তার বাবার খুন হওয়াটা তারই অপরাধ। সে মিনতিময় চোখে বলল, মাস্ট যু?

তপন কোনো বিনয় বা ভদ্রতার ধার ধারল না, সোজাসুজি বলল, হ্যাঁ, এবার শুনতে চাই। আর ডিলি-ড্যালি কোরো না।

অ্যালিস ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল, তারপর সেটাকে আবার সুষ্ঠুভাবে ভাঁজ করে রাখল টেবিলে। সাদা মদের গ্লাসে ছোটো চুমুক দিয়ে মুখ নীচু রেখেই বলল, খুন না বলে ওটাকে দুর্ঘটনাই বলা যায়। ওই লোকটা, ছবির ওই লোকটা, আমি তার নাম ভুলে গেছি

গোড়া থেকে বলো।

আমি যা জানি, তাই বলছি।

ঠিক আছে।

আমার বাবা ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন। নিজের বাবা বলেই বলছি না, তখনকার দিনের অন্যান্য কলোনিয়াল সার্ভেন্টদের থেকে আমার বাবা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি ব্রিটেনের অধীনস্থ দেশ বলেই শুধু মনে করতেন না, তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, তোমাদের দর্শন, শিল্পকলাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই ভারতবর্ষের লোকও ভালোবাসত আমার বাবাকে। সত্যিই আমার মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা আগে পোস্টেড ছিলেন রোডেশিয়াতে-কিন্তু তিনি নিজেই চেষ্টা করে ভারতবর্ষে ট্রান্সফার নেন। বুঝতেই পারছ, আমার মায়ের খুব আপত্তি ছিল-রোডেশিয়া অনেক কাছাকাছি-সেকালে জাহাজে ভারতবর্ষে যেতে সময় লাগত এক মাসের বেশি কিন্তু বাবার এত আগ্রহ ছিল- আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদা ছিলেন হোরেস হেম্যান উইলসন-বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ-হয়তো তুমি নাম শুনেছ।

হ্যাঁ শুনেছি। তুমি বলে যাও।

জান তার সম্বন্ধে? আমার বাবাও সংস্কৃত ভাষা শিখছিলেন। সেই জন্যই ভারতবর্ষে যেতে চেয়েছিলেন। প্রথমে নিউ দিল্লি, তারপর এলাহাবাদ, আমি এলাহাবাদেই জন্মেছিলাম। আমার একটুও মনে নেই এলাহাবাদের কথা। আমার খুব ইচ্ছে করে আবার যাই ওসব জায়গায়। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

তারপর?

এলাহাবাদ থেকে আমরা গেলাম ডাক্কা-তোমার দেশে

ডাকা নয়, ঢাকা।

ঢাকা? অল রাইট, ও জায়গার কথা আমার একটু-একটু মনে আছে, আমাদের বাংলোটা ছিল ভারি সুন্দর, পাশেই নদী-আর কলাগাছ-কী বিরাট বিরাট পাতা কলাগাছের-আমি আর কখনো এ-পর্যন্ত কলাগাছ দেখিনি-আমার বাবা ব্রিটিশদের সঙ্গেই শুধু না মিশে নেটিভদের, আই মীন বেঙ্গলি জেন্টলম্যানদের সঙ্গে মিশতেই বেশি ভালোবাসতেন-তারাও ভালোবাসত আমার বাবাকে। ওই লোকটি, দ্যাট ম্যান ইন দা ফোটোগ্রাফ ছিলেন আমার বাবার সংস্কৃত শিক্ষক, দু-জনের বেশ বন্ধুত্ব ছিল-ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রত্যেক সন্ধ্যে বেলা অনেক কিছু আলোচনা করতেন, মাঝে মাঝে বেশ তর্কও হত-কিন্তু হঠাৎ একদিন-

অ্যালিস একটু চুপ করতেই তপন মুখ তুলে তাকাল। এতক্ষণ তপন মুখ নীচু করে নিঃশব্দে ব্র্যাণ্ডি পান করে যাচ্ছিল। একটা দীর্ঘ চুমুকে গ্লাস শেষ করে তপন বলল, কী হল তারপর?

ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট-হঠাৎ বোধ হয় সেই লোকটির একদিন মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ-রকম হয় মাঝে মাঝেই তো শোনা যায়-হঠাৎ কোনো লোক পাগল হয়ে গিয়ে নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, রাস্তার লোক-যাকে পায় তাকেই খুন করতে ছুটে যায়। সেইরকমই কিছু হয়েছিল নিশ্চয়ই, অমন শান্তশিষ্ট লোকটি হঠাৎ কেনই-বা হিংস্র হয়ে উঠবে! আমার বাবা একটা ডাকাতির কেসে তিনজন বাঙালি যুবককে গ্রেপ্তার

করেছিলেন- ওই লোকটি এসে বাবাকে অনুরোধ করে তাদের ছেড়ে দিতে। আমার বাবা বলেছিলেন, ওরা ক্রিমিন্যাল, ওদের ছেড়ে দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই, আইন যা করবে তাই হবে। তখন ওই লোকটি চেঁচিয়ে বলল, না, ওরা ক্রিমিন্যাল নয়, ওরা মুক্তিসংগ্রামী। আমার বাবা খুব লম্বা লোক ছিলেন, তিনি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে লোকটির কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, লিসন, বাবু, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট তার এলাকার ল অ্যাণ্ড অর্ডারের ব্যাপারে তার সংস্কৃত শিক্ষকের পরামর্শ নেয় না। দুটো আলাদা ব্যাপার। ভবিষ্যতে এ-রকম কোনো অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আর তুলো না। তখন সেই লোকটি হঠাৎ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে বাবাকে আর কোনো কথা বলারই সুযোগ দেয়নি, খুব ক্লোজ রেঞ্জে পরপর তিন বার গুলি করে-আমি নিজের চোখে দেখিনি-আমার মা নাকি দেখেছিলেন-আমি তখন আয়ার সঙ্গে নদীর পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম-গুলির শব্দ পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছিলাম-বাবার মৃতদেহ আর আমাকে দেখতে দেওয়া হয়নি-শুনেছিলাম, বাবার মুখখানি এমন থেঁতলে গিয়েছিল যে চেনাই যায় না-ঢাকা শহরের বহুলোক কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, দীর্ঘ শোকযাত্রা হয়েছিল বাবার মৃতদেহ নিয়ে- অনেকে সারভিস অ্যাটেণ্ড করেছিল।

তপন ততক্ষণে বোতলের সবটুকু ব্র্যাণ্ডি শেষ করে ফেলেছে। এখন তার পেটব্যথা নেই, হাত কাঁপছে না, কিন্তু চোখ জ্বলছে। সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিতেই তার গলায় যেন ধোঁয়া জড়িয়ে গেল, তপন প্রায় ফিসফিস করে বলল, তারপর, সেই লোকটির কী হল?

আমি ঠিক জানি না। যতদূর মনে আছে, লোকজনের চেঁচামেচি আর ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লোকটি পালিয়ে যায়। আর কেউ কোনোদিন তার খোঁজ পায়নি।

এই ছবিটি কখন তোলা হয়েছিল? অ্যালিস যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। এবার আবার স্ব-কালে ফিরে এল। ছবিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, ওইটা? ওটা আমার মায়ের কাছে ছিল-আমি রেখে দিয়েছি। ছবিটা একসময় খুব বিখ্যাত হয়েছিল, টাইমস-এ ছাপা হয়েছিল-সেইসঙ্গে সমস্ত কাহিনিটাও-নিহত এবং হত্যাকারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে-এ-রকম ছবি তো সহজে দেখা যায় না। ওটা একটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সময় তোলা।

আমার বাবা সেই সেরিমনিতে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন লোকটির হাতে-ছবিতে দু জনে দু-জনের মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে। অথচ

তপন একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলল। তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করে বাংলায় বলল, ঘটনাটা এ-রকম নয়, এ-রকম নয়, অন্যরকম, আমি জানি

অ্যালিস তপনের কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কী বলছ টপন? তুমি ও-রকম করছ কেন? তোমার শরীর খারাপ লাগছে? ফিলিং ডিজি?

হ্যাঁ, একটু। আমাকে এক মিনিট ক্ষমা করো, ইয়ে, জায়গাটা কোথায়?

অ্যালিস তাড়াতাড়ি উঠে তপনকে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে এল। প্রায় টলতে টলতেই তপন ঢুকে পড়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হড় হড় করে বমি করে ফেলল বাথরুমের মেঝেতে। বাইরে থেকে অ্যালিসের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ভেসে আসতেই তপন কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিল, না, বিশেষ কিছু হয়নি। ডোন্ট ওরি, হানি! এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

ব্র্যাণ্ডি খেয়ে তপনের কোনোদিনও বমি হয়নি, তার লজ্জা করতে লাগল। চোখে মুখে ভালো করে ঠাণ্ডা জল ছেটাতেই অনেকটা সুস্থ মনে হল, বাথরুমের জানলা খুলে দিয়ে কনকনে হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নিতে তপনের মাথার ঝিমঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল। আঃ! ঘরের মধ্যে একেবারে বদ্ধ হাওয়া। আঃ! কিন্তু ঘটনাটা ও-রকম নয়, অ্যালিস। মোটেই ও রকম নয়। কিন্তু এই ঘটনাটা শোনার জন্য তপন কেন এখানে এল! না এলেও তো পারত! আজ সন্ধ্যে বেলা লণ্ডনের অন্য যেকোনো জায়গাতে থাকলেই তার সময় ফুরফুরে আনন্দে কেটে যেত, তাকে বমি করতে হত না! তপন নিজেকে অভিশাপ দিল মনে মনে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাথরুম থেকে বেরোল তপন। অ্যালিস তখন রেকর্ড প্লেয়ারে হালকা কনসার্ট দিয়েছে। নষ্ট হবার ভয়ে দামি পোশাকটা খুলে রেখে নেগলিজে ধরনের রাত পোশাক পরে নিয়েছে, ঘরের আলো মৃদু। কেউ কিছু মুখে বলেনি, কিন্তু দু-জনেই মনে

মনে জানত আজ সারারাত ওরা এক সঙ্গে থাকবে। পাতলা পোশাকের মধ্য দিয়ে অ্যালিসের বরবর্ণিনী শরীরের আভাস, চোখে-মুখে লাস্য, তপন স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটো লাল, চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, ভুরুতে কপালে লেগে আছে জলের ফোঁটা।

অ্যালিস জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে? ফিলিং অল রাইট?

না, অ্যালিস আমাকে এক্ষুনি হোটেলে ফিরে যেতে হবে।

কী? হোটেলে ফিরে যাবে? হোয়াই অন আর্থ–

উপায় নেই অ্যালিস। আমার পেটে বিষম ব্যথা হচ্ছে, ওযুধ আছে হোটেলের ঘরে, ওষুধ না খেলে সারারাত আমি যন্ত্রণায় ছটফট করব।

কী ওষুধ? এখানে কোনো ডিসপেনসারি থেকে কিনে আনছি আমি, তুমি নাম বলো–

না, তুমি পারবে না। লিস্টেড ড্রাগ, প্রেসক্রিপশান ছাড়া বিক্রি করবে না। প্রেসক্রিপশান আমার সঙ্গে নেই, আমাকে যেতেই হবে–

ঠিক আছে, তুমি দু-মিনিট অপেক্ষা করো, আমি পোশাক পরে নিচ্ছি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব

না, না, তোমাকে আর যেতে হবে না।

বাঃ, এই অবস্থায় তুমি একা যাবে নাকি?

ঠিক পারব। লক্ষ্মীটি অ্যালিস, তুমি চিন্তা কোরো না, আমার গ্যাসট্রিকের ব্যথা ওষুধ খেলেই কমে যাবে–তারপরেই ঘুম আসবে–তুমি আবার একা একা ফিরবে?

আমি ঠিক ফিরতে পারব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

সত্যিই তোমার যাবার কোনো দরকার নেই। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব

ট্যাক্সিতে এতখানি রাস্তা? তিন-চার পাউণ্ড ভাড়া উঠে যাবে-তার চেয়ে আমি বরং তোমার সঙ্গে টিউবে।

না, তার দরকার নেই। আমি ট্যাক্সিতে যাব।

যদি ওই ওষুধে তোমার ব্যথা না কমে? যদি হাসপাতালে যেতে হয়? এখনও খুব ব্যথা করছে?

খুব। কিন্তু হাসপাতালে যেতে হবে না। আজ বড্ড বেশি অ্যালকোহল খেয়ে ফেলেছি, দুপুর থেকে জিন খাচ্ছিলাম, তারপর তোমার এখানে-

তা হলে কাল কখন দেখা হবে?

-কাল, তোমার অফিস ছুটির পর আমি তোমাকে পিক আপ করে নেব। কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়-পিকাডেলি সারকাসে, এরসের মূর্তির কাছে-গুড নাইট, অ্যালিস।

.

০২.

টেড-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সানফ্রান্সিসকো থাকার সময়। দু-জনেই তখন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছে। আমেরিকায় পৌঁছে প্রথম কিছুদিন তপনের খুব মন খারাপ লাগত। ঠিক যে দেশের জন্য মন কেমন করত, তা নয়। বাংলাদেশের ওপর রাগ করেই তপন বাংলাদেশ ছেড়েছিল, সে-রাগ তখনও একটুও কমেনি। নিজের দেশের জন্যও মন কেমন করে না, অথচ বিদেশেও ভালো লাগছে না-এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ছিল তখন তপন।

কলকাতায় যখন তপন পি এইচডি-র থিসিস দিয়েছিল-তখন তার অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন বার্কলে ইউনিভার্সিটির ড. লেভিন। ড. লেভিনই তপনের কাজ দেখে খুশি হয়ে লিখেছিলেন যে, তপন যদি আমেরিকায় এসে গবেষণা করতে চায়-তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। কলকাতায় দলাদলি, নোংরামি এবং নীচতা দেখে দেখে সেসময় তপনের বুকভরতি অভিমান, ড. লেভিনের আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছিল। কাজ করবার সুযোগ ছাড়াও মাসে সাড়ে চার-শো ডলার স্কলারশিপ-দু-বছরের মধ্যেই সেটা বেড়ে সাড়ে আট-শো ডলার হয়েছিল-অত টাকা পাবার কথা তপন কখনো কল্পনাই করেনি। কলকাতায় একটা কলেজে সে সামান্য আড়াইশো টাকার একটা লেকচারার পদের জন্য আবেদন করেও পায়নি, তপন ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল-তবু তাকে ডিঙিয়ে হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের অগামারা ভাইপোকে সেটা দেওয়া হয়েছিল।

গরিবের ছেলে তপন, বিদেশে যাওয়ার খরচ জোগাড় করা তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। তখন সিগারেট কিনে খাবারও সামর্থ্য ছিল না তার, বন্ধুবান্ধবরা না খাওয়ালে বিকেলে জলখাবার খাওয়ার বিলাসিতার কথাও ভাবতে পারত না। ড. লেভিনের প্রস্তাবটা পেয়ে তপন যেন আবার বাঁচার স্বাদ ফিরে পেল। প্লেন ভাড়ার জন্য স্কুল ব্রাইট স্কলারশিপ জোগাড় করতে খুব অসুবিধে হল না। মাকে প্রণাম করে তপন যেদিন কলকাতা ছেড়ে আকাশে উড়ল-সেদিনই তপন একরকম ঠিক করে ফেলেছিল-সম্ভব হলে সে আর দেশে ফিরবে না। মা যদি খুব কান্নাকাটি করেন-তবে অবশ্য আলাদা কথা, তখন তাকে ফিরতেই হবে-বিধবা মা নিশ্চয়ই আমেরিকায় গিয়ে তার সঙ্গে থাকতে চাইবে না। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তপনের আর কোনো দ্বিধা রইল না।

তপন যখন সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছোয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয় খোলেনি, নতুন সেমেসটার আরম্ভ হতে তখনও এক সপ্তাহ দেরি আছে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে তপন সম্পূর্ণ একা, ড. লেভিন ছাড়া আর একটা মানুষকেও চেনে না। আসার পথে লণ্ডনে মাত্র দু-দিনের জন্য থেমেছিল-সেখান থেকে সোজা চলে এসেছে সানফ্রান্সিসকোতে-অকস্মাৎ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সানফ্রান্সিসকো শহরটা ছবির মতন সুন্দর-অত সুন্দর বলেই

নিঃসঙ্গতা আরও বেশি করে মন ভারী করে দেয়। গোল্ডেন গেট ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে তপনের মনে হত, তার অতীতকে সে অস্বীকার করে চলে এসেছে, তার সামনে কোনো ভবিষ্যতের ছবিও নেই।

সেই সময়েই টেডের সঙ্গে আলাপ। তখনও ওরা কেউ জানত না যে ওরা দু-জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে ভরতি হয়েছে। সেসময় সানফ্রান্সিসকোয় বিটনিকদের ছড়াছড়ি। এই বিটনিকদের বলা যায়, হিপিদের পূর্বপুরুষ। টেডকে দেখে বোঝাই যায়নি, সে বিজ্ঞানের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। টেডও একমুখ দাড়ি রেখেছে, ময়লা ট্রাউজার্সের সঙ্গে একটা বুকখোলা শার্ট, মাথার চুলগুলো রুক্ষ। কলম্বাস অ্যাভিনিউতে একটা বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তপন পত্রপত্রিকা দেখছিল, পাশেই টেড একজোড়া যুবক-যুবতীর সঙ্গে তর্কে মত্ত। তর্কের বিষয় শুনে তপন কান খাড়া করেছিল। টেড ও তার বন্ধুবান্ধবীরা শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎ গীতা নিয়ে খুব গরম গরম আলোচনা জুড়েছে। তপন শাস্ত্র-টাস্ত্র তেমন পড়েনি, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান থেকেই সে ওদের জ্ঞানের বহর টের পেয়ে হাসছিল মৃদু মৃদু। টেডের ধারণা, গীতা হচ্ছে বেদেরই একটা অংশ, বেদের চারটে ভাগ–তার চতুর্থ ভাগের নাম গীতা এবং সেটা এমনই উচ্চাঙ্গের বই যে যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে–ইউরোপ যদি ও বইয়ের সন্ধান পেত– তা হলে ইউরোপে আর কেউ খ্রিস্টান না হয়ে সবাই হিন্দু হয়ে যেত।

তপন শুধু শুনছিল, কোনো কথা বলেনি। কিন্তু একবার ও আর সামলাতে পারল না, উপযাচক হয়েই কথা বলে ফেলল। যিশুখ্রিস্টের নাম যেমন যিশাস ক্রাইস্ট, কিন্তু শুধু যিশাস বললেও তাঁকেই বোঝায়, সেইরকম, টেডের ধারণা শ্রীকৃষ্ণকে শুধু শ্রী বলেও ডাকা যায়। শ্রী যেন কৃষ্ণের ডাক নাম। তপন হাসিমুখে ওদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেছিল, এক্সকিউজ মি, বোধ হয় আপনাদের ভুল হচ্ছে–

সেই থেকে আলাপ। টেড এক নিমেষে মানুষকে বন্ধু করে নিতে জানে। সেইদিনই সন্ধ্যে বেলা তপনকে ডিনার খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করল টেড। তপনের ব্যক্তিগত কোনো কথা

জানতে চাইল না, তপন কেন আমেরিকায় এসেছে সে-সম্পর্কে আগ্রহ দেখাল না–শুধু ভারতবর্ষ আর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন করতে লাগল।

কলেজ খোলার পর একই ডিপার্টমেন্টে যখন দু-জনে দু-জনকে আবিষ্কার করল, তখন দু জনেই খুশি হয়ে উঠল। টেড কোনোদিনই কেতাদুরস্ত পোশাক পরে না কিংবা গলায় টাই বাঁধে না। ওর মাথার চুলগুলো একেবারে সোনালি–রোদ্দুর লাগলে মনে হয় জ্বলজ্বল করছে–সেই চুলে বোধ হয় বহুবছর চিরুনি পড়েনি। কথাবার্তার মধ্যে টেড এমন শব্দ ব্যবহার করে–যা শুনলে কিছুদিন আগেও তপন লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। টেডের ঘরে তপন একটি মেয়েকে দেখেছিল, দারুণ সুন্দরী মেয়েটি, ছবি আঁকে–টেডের সঙ্গেই এক ঘরে থাকে কিন্তু ওদের বিয়ে হয়নি। টেড অম্লানবদনে সেকথা তপনকে জানিয়েছিল–সেবিষয়ে টেড কিংবা সেই মেয়েটি, জুডিথ–কারুরই কোনো দ্বিধা বা লজ্জা নেই। টেডের চরিত্রে এমন একটা চারুলতা ও পাগলামি ছিল–যা তপনের খুব ভালো লাগত। টেডের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়ে গেল তপনের। এসব পাগলামি সত্ত্বেও, ছাত্র হিসেবে টেড সাংঘাতিক মেধাবী অধ্যাপকরাও তাকে খাতির করত এইজন্য। টেডের সাহচর্যে তপনের অনেক সংস্কার যেমন কেটে গেল–তেমনি পড়াশুনোর ব্যাপারেও খুব উপকার হল।

তপন প্রথম দিকে বেশ কয়েকমাস জানতেই পারেনি যে টেড জাতে ব্রিটিশ। বছর চারেক আগে একটা স্কলারশিপ পেয়ে টেড ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় এসেছিল–এখন আমেরিকার জীবন তাকে এমন আকর্ষণ করেছে যে, সে আর ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে চায় না। ব্রিটিশ জাতের প্রতি তপনের বরাবরই একটা বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু টেডের মধ্যে সে ব্রিটিশ জাতের অন্য একটা দিক দেখতে পেল। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উঠলে টেড মাঝে মাঝে একটু চুপ করে যেত। তারপর আস্তে আস্তে বলত, আমার ঠাকুরদা আসামের দুটো চা বাগানের মালিক ছিলেন। চাবুক মেরে কী করে তিনি কুলিদের শায়েস্তা করতেন–সে-গল্প প্রায়ই করতেন সাড়ম্বরে। তুমি ইণ্ডিয়ান, একথা শুনে রাগ হচ্ছে না তোমার? প্রতিশোধ নিতে চাও? ঠিক আছে তপন আমি জামা খুলে দাঁড়াচ্ছি–তুমি আমার পিঠে চাবুক মেরে তার শোধ নিতে পার।

তপন তখন হেসে ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলত, এ কী টেড, এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ কেন? আমি জাতে বিশ্বাস করি না, আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না–আমার ওসবে কিছু যায়-আসে না। ভারতবর্ষ দুর্বল ছিল–তাই ব্রিটিশরা তার সুযোগ নিয়েছে।

টেড বলেছিল, তুমি সত্যিই ব্যাপারটা ভুলে যেতে পার? আমাকে দেখলে তোমার একটুও রাগ হয় না?

তপন জোর দিয়ে বলেছিল, না রাগ হবে কেন? আমি ওসব ভুলে গেছি।

টেড বলেছিল, তা পার তুমি একজন গ্রেটম্যান। আমি কিন্তু আমার জাতের কলঙ্কের কথা ভুলতে পারি না। ব্রিটিশরা অবশ্য অনেক কলোনিতেই অত্যাচার করেছে কিন্তু আমার বংশের পূর্বপুরুষরা সবাই ভারতবর্ষ থেকেই সম্পদ চুরি করে এনেছে–আমি ভারতবর্ষের কথাই বেশি জানি। তাঁরা যেসব নিয়ে গর্ব করতেন–তা নিয়ে আমার লজ্জা হয়।

তপন বলেছিল, তুমি একজন পদার্থবিদ, তুমি এত পুরোনো ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? আমি ইতিহাসে কোনো ইন্টারেস্ট পাই না। পদার্থ কীভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়- সেই রহস্যই আমাকে বেশি টানে।

আমেরিকায় টেডের সঙ্গেই তপনের সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। টেডের গাড়িতে চড়ে ও সারা আমেরিকা ঘুরেছে, টেডের সঙ্গে ও নেভাডায় গিয়ে জুয়া খেলেছে, শিকাগোয় নাইট ক্লাবে সারারাত ধরে নেচেছে, লস এঞ্জেলসে গিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কেটেছে। সবসময় সঙ্গে দু টি করে মেয়েও থাকত! টেডের মত হচ্ছে যে, সপ্তাহে অন্তত সাত ঘণ্টা মেয়েদের সংসর্গে না কাটালে পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হয়ে যায়। আবার তার চেয়ে বেশি সময় কাটালেও ভোঁতা হয়ে যায়।

তপন আবার লণ্ডনে এসেছে টেডেরই বিশেষ অনুরোধে। তপনের কথা ছিল কানাডায় যাওয়ার। মা মারা যাওয়ার পর ভারতবর্ষে ফেরার ইচ্ছে তার সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় স্থায়ীভাবে ইমিগ্রান্ট হতে হলে প্রথম পাঁচ বছর কাটার পর দু-বছর

আমেরিকার বাইরে কাটাতে হয়। সুতরাং কাছাকাছি কানাডাতেই থাকা সবচেয়ে সুবিধের- কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরিও সহজে পেয়ে গেল-মাসে এগারো-শো ডলার মাইনে। সেপ্টেম্বর থেকে কলেজ খুলবে, মাঝখানে দু-মাস ছুটি- তপনের হাতে অনেক টাকা জমে গেছে-ও ভেবেছিল এই দু-মাসে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো বেড়িয়ে আসবে-এমন সময় দেশ থেকে চিঠি এল, কাকার মেয়ে টুকুর বিয়ে হচ্ছে, তপনকে আসতেই হবে। তপন না গেলে টুকু মনে আঘাত পাবে-কাকা-কাকিমা কেউই তৃপ্তি পাবেন না।

চিঠিটা পেয়ে তপন একটু হেসেছিল। মা মারা যাবার পর বাড়ি থেকে চিঠি আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং তপন বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে ও অনেক টাকা রোজগার করছে-অস্পষ্টভাবে এই খবর পেয়ে কাকা-কাকিমা আবার মহা উৎসাহে তাকে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তপন ভেবেছিল, এটাই তো স্বাভাবিক। টাকার তো একটা বিশেষ সম্মান থাকবেই কাকার অবস্থা খুব খারাপ নয়, ডাক্তার হিসেবে ভালো পসার আছে--ওঁরা হয়তো তপনের টাকার প্রত্যাশা করেন না-কিন্তু বড়োলোক আত্মীয়দের খাতির করাই সামাজিক নিয়ম। নিজে না গিয়ে একটি দামি উপহার পাঠিয়ে দিলেই চলত-কিন্তু তপন হঠাৎ ঠিক করে ফেলল-এই দু-মাসের জন্য সে ভারতবর্ষে ঘুরে আসবে। এ তো আর দেশে ফেরা নয়, টুরিস্টরা যেমন বিদেশে বেড়াতে যায়-এও সেইরকম বেড়ানো। আর দু-এক বছর পর তপন আমেরিকার নাগরিক হয়ে যাবে- ভারতবর্ষ তার কাছে বিদেশ ছাড়া আর কী!

তাও তপন ঠিক করেছিল, যাওয়ার পথে লণ্ডনের রুটে না গিয়ে ফ্রান্স-ইটালি ঘুরে যাবে। লণ্ডন দেখেছে আসার পথে, তার ভালো লাগেনি, তার চেয়ে প্যারিস-রোম দেখাই তার ইচ্ছে! কিন্তু টেডকেও ঠিক এই সময় লণ্ডনে যেতে হল। এক দূর সম্পর্কের পিসিমা মারা যাওয়ার সময় টেড হঠাৎ কিছু সম্পত্তি পেয়েছে-টেড সেটা আনতে যাবে- তপনও সেসময় ভারতবর্ষে যাবে শুনে তপনকে লণ্ডনে থামার জন্য টেড একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে যায়।

অবশ্য টেডের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তপন টেডের বাড়িতে ওঠেনি। গ্রাভনার কোর্টের কাছে এক হোটেলে উঠেছে তপন–এখান থেকে পিকাডেলি সার্কাস কিংবা হাইড পার্ক কোনোটাই খুব দূরে নয়। দিনে চার পাউণ্ড ঘর ভাড়া–তবু তপনের গায়ে লাগে না, তার হাতে এত টাকা জমেছে এই পাঁচ বছরে। লণ্ডনে সাতদিন থাকার পর নিউ ক্যাসেলে চলে গেছে টেড। ওই সাতদিন হর্সফেরি রোডে টেডের বাড়িতে প্রত্যেক সন্ধ্যায় পার্টি লেগে থাকত–সেখানে তপন রোজ হাজির হয়েছে।

সেখানেই দু-টি মেয়ের সঙ্গে আলাপ, বারবারা আর অ্যালিস। টেডের পার্টিতে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশজন নারী-পুরুষ উপস্থিত থাকত, তাদের মধ্যে ওই দু-জনকেই টেডই দেখিয়েছিল আলাদা করে। তপনকে আড়ালে ডেকে টেড বলেছিল, শোনো টপ, লণ্ডনে যে ক-দিন থাকবে–তুমি বোকার মতন একা একা ঘুরবে–তা আমি চাই না। একটা মেয়ে সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকে। ওই যে দুটি মেয়ে, বারবারা আর অ্যালিস–আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি–ওরা দু-জনেই এখন অনেকটা ফাঁকা আছে–ওদের কোনো স্টেডি বয়ফ্রেণ্ড নেই–তুমি ওদের দুজনের যেকোনো একজনকে বেছে নাও–তারপর, তোমার যা খুশি

কিন্তু বেছে নেওয়া অত সহজ নয়। অ্যালিস আর বারবারা- দু-জনের প্রায় একইরকম চেহারা। বারবারা কুমারী-অ্যালিসের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোটো, আর অ্যালিসের একবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে–তবু দু-জনেরই তন্বী শরীর, ভরাট স্তন, ছন্দোময় পদক্ষেপ, সুদৃশ্য দাঁতের পাটি, উপস্থিতিতে একইরকম প্রসাধনের সুগন্ধ। সোহো পল্লির এক রেস্তোরাঁয় পর পর দু-দিন আলাদাভাবে ওদের দুজনকেই নেমন্তন্ন করেছিল তপন। দু জনেরই কথাবার্তা সুন্দর, দু-জনের কারুরই রঙের ব্যাপারে গোঁড়ামি নেই। যেকোনো রসিকতা ওরা দুজনেই চট করে বুঝতে পারে, মধুর ঝংকারে হাসে মাথা দুলিয়ে। তপনের ব্যবহারে ওদের চোখে-মুখে একটা মুগ্ধতা ফুটে উঠেছিল। তপনের সুঠাম স্বাস্থ্য, নিখুঁত আদবকায়দা, সাবলীল ভঙ্গি–তা ছাড়া মেয়েদের কাছে এসে তপন কোনোরকম গদগদ ভাব দেখায় না, প্রায় প্রথম আলাপ থেকেই হুকুমের সুরে কথা বলে–এটাও ভালো লাগে মেয়েদের। তপন টাকাও খরচ করে খোলামকুচির মতো–তাকে দেখে একবারও মনে হয়

না সে গরিব ভারতবর্ষের লোক, সে অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। রেস্তোরাঁয় বিল মেটাবার সময় তপনের কাছে খুচরো পাউণ্ড ছিল না, ম্যানেজারকে ডেকে বলল সে একটা এক-শো ডলার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে চায়–টাকাগুলো পেয়ে গুণেও দেখল না পর্যন্ত, অবহেলাভরে তার থেকে আস্ত একটা পাউণ্ড সে বেয়ারাকে বকশিশ দিয়ে দিল! তাই দেখে বারবারা বলেছিল, আমি এ-পর্যন্ত কারুকে চার পাউণ্ডের বিল মেটাতে গিয়ে এক পাউণ্ড বকশিশ দিতে দেখিনি!

বারবারা আর অ্যালিস-যেকোনো একজনকেই সে বেছে নিতে পারত। আঃ, তপন ভাবল, কেন সে বারবারাকে বেছে নেয়নি! তা হলে এই সন্ধ্যেটা কত আনন্দে কাটতে পারত। নিছক একটা দুর্ঘটনা! শুধু একটা নাম, বারবারার আর কোনো দোষ ছিল না-কিন্তু তার নামটা তপনের পছন্দ হয়নি। আর কোনো আলাদা বিশেষত্ব ছিল না অ্যালিসের, শুধু নামটাই তার সুন্দর বারবারার চেয়ে। অ্যালিস নামের মধ্যেই একটা রূপকথার গন্ধ, স্বপ্নের গন্ধ, হঠাৎ শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়-শুধু এইজন্যই মনে মনে বেছে নিয়েছিল অ্যালিসকে। আর, সঙ্গে সঙ্গেই পাশার দান পড়ে গেল।

বারবারা তপনের মনের ভাব বুঝতে পেরে নিজে থেকেই সরে গিয়েছিল। তারপর শুধু অ্যালিসের সঙ্গে পার্কে পার্কে ঘোরা, সিনেমা, আর্ট গ্যালারি, প্রত্যেকদিন একসঙ্গে ডিনার আর হোটেলে বহুরাত পর্যন্ত অ্যালিস তাকে সঙ্গ দিয়েছে। অ্যালিসকে তপন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি, কোনো মিথ্যেকথা বলেনি-স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে, সে মাত্র আঠারো দিন থাকবে ইংল্যাণ্ডে, তারপর চলে যাবে-আর হয়তো সারাজীবন দেখা হবে না অ্যালিসের সঙ্গে। শুধু হালকা উচ্ছল আনন্দের কয়েকটি দিন। কিন্তু উচ্ছলতায় নিবিড় ছায়া পড়ল। দাবির চেয়েও অতিরিক্ত দিতে চায় অ্যালিস, তার অন্য সব পুরুষবন্ধুদের ভুলে শুধু তপনের সঙ্গেই থাকতে চায়। লোভী মেয়ে নয় অ্যালিস, তপনের টাকাপয়সা খরচ করিয়ে ফুর্তি করাই তার উদ্দেশ্য নয়, বরং তপন বেশি খরচ করলে অ্যালিস খুব আপত্তি জানায়। একদিন সামান্য জ্বর হয়েছিল তপনের, সেদিন অ্যালিসের মুখে পড়েছিল জননী বা জায়ার মতো আশঙ্কায় ছায়া।

আজই প্রথম তপন এসেছে অ্যালিসের ঘরে। আজ অ্যালিসের জন্মদিন, শুধু তপনকেই একা নেমন্তন্ন করেছে সে। কেউ মুখে কিছু বলেনি, তবু যেন মনে মনে ঠিক ছিল–আজ সারারাত ওরা একসঙ্গে কাটাবে। অল্প আসবাবেও বেশ সুন্দর ছিমছাম সাজানো অ্যালিসের ঘর। লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করে অ্যালিস, মাইনে খুব বেশি পায় না, কিন্তু ঘরে কোনো দারিদ্র্যের ছাপ নেই। পর্দার রঙের সঙ্গে বেডকভার; সোফা আর ড্রেসিং টেবিলের ম্যাটের রং মেলানো। কিন্তু সব কিছু ভালোভাবে দেখবার সুযোগ হয়নি তপনের। ঘরে ঢোকবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চুম্বকের মতন দেয়ালের একটা ছবি তাকে টেনে নিয়ে গেল। ছবিটা থেকে তপন চোখ ফেরাতে পারেনি। আকৃষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, ওই ছবিটা এখানে কেন?

অ্যালিস লঘু হাস্যে বলেছিল, ওটা একটা ছবি। এক সময় টাইমস-এর ক্রিসমাস সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

তপন অ্যালিসের সঙ্গে হাসির সৌজন্য বিনিময় করেনি। আরও কাছে গিয়ে ছবিটা পরীক্ষা করেছিল এক দৃষ্টে। তারপর :

ওই ছবিটা কার?

আমার বাবার।

না, পাশে দাঁড়ানো লোকটি?

ওই ব্যক্তি আমার পিতার হত্যাকারী–

কেন টেডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল? কেন টেডের অনুরোধে লণ্ডনে এসেছিল? কেন সে অ্যালিসের বদলে বারবারাকে বেছে নেয়নি? তা হলে আর তপনের বুকে পুরোনো ক্ষতের ব্যথা জেগে উঠত না।

৩-৪. হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে

হোটেলে ফিরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল তপন। শরীর এখন ঠিক আছে, বরং বমি হবার পর বেশ ঝরঝরে লাগছে, পেটের ব্যথা একটুও নেই। তবু দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিল। টাইয়ের গিট খুলতে বুকটা অনেকটা হালকা হয়ে এল। এক এক করে সমস্ত পোশাক খুলে, ঘরের তাপটা একটু বাড়িয়ে ঢুকে পড়ল কম্বলের মধ্যে। আলো নেবাতে যাবে-ঠিক সেই সময় মাথার কাছে টেলিফোন বেজে উঠল। তপন অলসভাবে রিসিভারটা তুলে বলল, হ্যালো-

অ্যালিসের উদগ্রীব কণ্ঠ, টপন, আর যু অল রাইট? ব্যথা কমেছে? সত্যি করে বলো-

অ্যালিসের ঘরে টেলিফোন নেই। সারাবাড়িতে একটাই মাত্র টেলিফোন দোতলার বারান্দায় রাখা। ওদের ল্যাণ্ডলেডি রাত দশটার পর টেলিফোন করা একেবারেই পছন্দ করে না- অ্যালিস আগেই বলেছে তপনকে। অ্যালিসের ল্যাণ্ডলেডির ধারণা-ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদ হলেই মানুষ বেশি রাতে টেলিফোন করে-সুতরাং দশটার পর টেলিফোন শুনলেই তার বুক ধড়ফড় করে। তবু অ্যালিস লুকিয়ে টেলিফোন করতে এসেছে, কথা বলছে। ফিসফিস করে।

তপন বলল, হ্যাঁ ডার্লিং, এখন প্রায় ভালো হয়ে গেছি। খুব ঘুম পাচ্ছে। ফিলিং, ভেরি শ্লিপি।

টপন, সত্যি করে বলো, ব্যথা কমেছে কি না! আমার এমন ভয় করছিল, তুমি চলে যাবার পর

কিছু ভয় নেই। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো-বি আ গুড গার্ল অ্যাণ্ড গেট সাম স্লিপ। কাল রাত্রেও ভালো ঘুম হয়নি তোমার। গভীর ঘুম হোক তোমার, কোনো স্বপ্ন দেখো না।

না। আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখতে চাই।

উঁহু। স্বপ্ন দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন ভালো নয়। কাল দেখা হবে। ও রেভোয়া–

টেলিফোন রেখে তপন আলো নেবাল, কম্বলটা টেনে দিল মাথা পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ অন্ধকার। এইরকম অন্ধকারে অনেক কিছু দেখা যায়।

তপন মনে মনে কাতরভাবে উচ্চারণ করল, না অ্যালিস, গল্পটা ও-রকম নয়–অন্য রকম। দুর্ঘটনা নয়, মুহূর্তের পাগলামি নয়। আমার বাবা পনেরো বছর বয়েস থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি কোনো ইংরেজকে খুন করে প্রতিশোধ নেবেন। গল্পের আরম্ভ উনিশ-শো আটত্রিশে নয়, উনিশে–

তপন তখনও জন্মায়নি। কিন্তু চোখ বুজলেই সব ছবির মতন স্পষ্ট দেখতে পায়। কতবার সে শুনেছে সেসব দিনের কথা, মায়ের মুখে, ছোটোকাকার মুখে, ঠাকুমার মুখে। তার বাবার কোনো ভালো ছবি ছিল না বাড়িতে, একখানা গ্রুপ ফোটোর মধ্যে আঠারো জনের ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা বাবার মুখখানা শুধু তপন দেখেছে, আর আছে চন্দন দিয়ে তোলা তার বাবার একখানা পায়ের ছাপ। তবু, বাবার যুবা বয়সের সম্পূর্ণ চেহারা তপন কল্পনায় স্পষ্ট দেখেছে। তাই ওই ছবি চিনতে তার একটুও দেরি হয়নি।

...উনিশ-শো উনিশ, ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়ংকর হত্যাকান্ড ঘটে গেছে, সারা ভারতবর্ষের হৃৎপিন্ড তার পরদিন থেমেছিল, সেদিন ঢাকা শহরে হরতাল। সেই প্রথম প্রকাশ্য মিছিলে পূর্ববঙ্গের নারীরাও যোগ দিয়েছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই, তুমুল কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে কান্নার আভাস, গান উঠেছে দিবে প্রাণ দিবে না মান কভু ভারত সন্তান এবং সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিড়িতে হবে। শহর তোলপাড় করা সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আছেন প্রিয়নাথ–তপনের জ্যাঠামশাই। প্রিয়নাথ তখন সাতাশ বছরের যুবা, অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্য, বুকে অসীম সাহস, কণ্ঠে বজ্রের গর্জন, তাঁরই হাতে তেরঙা পতাকা। তপনের বাবা দেবনাথের তবু যা হোক একটা ছবি অন্তত আছে কিন্তু প্রিয়নাথের কোনো ছবিই নেই।

নবাবগঞ্জ ধরে এগোচ্ছিল মিছিল, পুলিশবাহিনী আসার আগেই মুখোমুখি পড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নর্থব্রুক। ঘোড়ায় চড়ে তিনি প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছিলেন। প্রত্যেকদিন সকালে তিনি কুড়ি-পঁচিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যায়াম করতেন। বেপরোয়া কর্নেল সাহেবের বুকে একটুও ভয় নেই, মিছিল দেখে তিনি অধর দংশন করে বক্র হাস্য করেছিলেন। গম্ভীরভাবে হুকুম দিয়েছিলেন, হাটো পথ ছাড়!

কথা ছিল হিংসার আশ্রয় নেওয়া হবে না। শুধু শুধু পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে রাইফেলের গুলিতে আরও কয়েকটি অমূল্য প্রাণ নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। নেতারা এগিয়ে এসে করজোড়ে জানালেন, সাহেব, এ মিছিল ভাঙা যাবে না, আপনি দয়া করে অন্য পথে যান।

সাহেব বললেন, ননসেন্স! মাই হর্স ইজ টায়ার্ড! পথ ছাড়ো, নইলে আমি গায়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে বাধ্য হব।

সাহেব, এই লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল এখন ভাঙা যাবে না। আমরা কোনো অবৈধ কাজ করছি না, আমরা শুধু শোক জানাতে বেরিয়েছি।

দিস মার্চ ইজ আন ল ফুল-ডিসপার্স ইমিডিয়েটলি।

নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন পতাকা হাতে সাহেবের দিকে এগিয়ে এলেন প্রিয়নাথ। ঘোড়ার ওপর বসা বিশাল চেহারার কর্নেল সাহেব গর্জন করে উঠলেন, স্টপ ওয়েভিং দ্যাট স্টিংকিং আগলি ব্যানার নিয়ার মি! রাস্তা মানুষের চলাচলের জন্য, তোমাদের দঙ্গল মিলে হল্লার করবার জন্য নয়! ক্লিয়ার আউট! অ্যাণ্ড ইউ, উইথ দ্যাট ব্যানার-গেট দা হেল আউট অব হিয়ার!

প্রিয়নাথ পতাকা নামালেন না, শান্তভাবে বললেন, সাহেব এটা আমাদের দুঃখের মিছিল। শুধু তোমার ঘোড়ার জন্য এ মিছিল ভাঙা যাবে না। তুমি অন্য রাস্তা দিয়ে যাও।

তোমরা মিছিল ভাঙবে না।

তোমার জন্য অন্য পথ খালি আছে–

নর্থব্রুক সাহেব আর তর্কের মধ্যে যাননি। অসীম সাহস লোকটার–সঙ্গে পুলিশবাহিনী নেই, একা, কোমরে পিস্তল থাকলেও–অতগুলো লোক শুধু নখ দিয়েই ওকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিতে পারে–কিন্তু সেসব পরোয়া করেন না, হাতের চাবুকটা তুলে শপাং করে মারলেন প্রিয়নাথের মুখে। কপাল, বাঁ- চোখ আর গালে আড়াআড়ি ভাবে পড়ল চাবুকটা, চোখের ভেতর পর্যন্ত কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু প্রিয়নাথ তেমন বিচলিত হলেন না–পতাকায় যাতে রক্ত না লাগে–সেইজন্য সেটা অন্য একজনের হাতে তুলে দিলেন। তারপর রক্তমাখা অস্বাভাবিক মুখ তুলে সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, কী? তুমি কী চাও? তুমি মারতে চাও? আমাদের কতজনকে তুমি মারবে? মারতে মারতেও আমরা শেষ হব না, আমরা রক্তবীজের ঝাড়

কর্নেল তখন এলোপাথাড়ি চাবুক চালাচ্ছেন। তিন-চার ঘা চাবুক খাবার পর প্রিয়নাথ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, শূন্য পথেই একবার চাবুকটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। সাহেবের হাত থেকে চাবুক চলে এল তাঁর হাতে। সেই চাবুক হাতে ভয়ংকর রক্তমাখা মুখে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ তীব্রভাবে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে অন্য পথে যেতে বলেছিলাম। যদি না যাও, আমি যেতে বাধ্য করব।

নর্থব্রুক প্রিয়নাথের হ্যাঁচকা টানে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনোক্রমে সামলে নিয়ে পিস্তলে হাত দেবার আগেই প্রিয়নাথ শপাং শপাং করে চাবুক কষালেন ঘোড়ার মুখে। বিশাল ওয়েলার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল দু-পায়ে ভর দিয়ে তারপর উলটো দিকে ফিরে প্রাণপণে ছুটতে লাগল, হঠাৎ ঝাঁকুনিতে একেবারে হেলে পড়েছিলেন নর্থব্রুক–কোনোক্রমে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলেন। সেই দুঃখের মিছিলেও সেদিন এক মুহূর্তের জন্য শোক ভুলে হাজার হাজার মানুষ হেসে উঠেছিল নর্থব্রুকের অবস্থা দেখে।

পুলিশবাহিনী অবশ্য প্রায় তক্ষুনি এসেছিল। বেপরোয়া লাঠি এবং গুলি চলে তারপর, সাতাশ জন আহত হয়, তিন জন প্রাণ হারায়। কিন্তু ঘটনা সেখানেই শেষ নয়।

পরদিন ভোর বেলা প্রিয়নাথদের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছিল। প্রিয়নাথ তখন জ্বরে বেহুশ। সবাই জানত, প্রিয়নাথের খোঁজে পুলিশ আসবেই। কিন্তু প্রিয়নাথকে অন্য কোথাও সরাবার উপায় ছিল না। কোনো বাড়িই তাঁকে লুকিয়ে রাখতে ভরসা পায়নি, প্রিয়নাথেরও পালাবার সামর্থ্য ছিল না। ঘোড়ার বিষাক্ত চাবুক কেটে কেটে বসেছিল তাঁর শরীরে, চোখের মধ্যে ঢুকেছিল–সেই দিনে সন্ধ্যে বেলাই প্রিয়নাথের সমস্ত মুখ-চোখ ফুলে প্রচন্ড জ্বর এসেছিল–ব্যথায় আর কোনো আর্তনাদ করেননি প্রিয়নাথ, শুধু মা মা বলে ডাকছেন–সুতরাং প্রিয়নাথের মা ছেলেকে বাড়িতেই রেখেছিলেন নিজের কাছে।

পুলিশ এসে বিছানা থেকে হেঁচড়ে তুলে এনেছিল প্রিয়নাথকে। বন্দুক হাতে বারো জনের পুলিশ পার্টি–পুরোভাগে নর্থব্রুক স্বয়ং। নর্থব্রুকের হাতে চাবুক। চার জন জোয়ান পুলিশ দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল প্রিয়নাথকে, আর নর্থব্রুক চাবুক চালাতে লাগলেন।

প্রিয়নাথের তখন এক-শো চার ডিগ্রি জ্বর, বাঁ-দিকের চোখ ঢেকে ব্যাণ্ডেজ, ডান চোখটা অস্বাভাবিক লাল, সারারাত ধরে প্রলাপ বকেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, বার বার ঢলে ঢলে পড়ে যাচ্ছেন–আর হ্যাঁচকা মেরে তুলে ধরছে চার জন পুলিশ। সাপের মতন হিসহিসে গলায় বলেছিলেন নর্থব্রুক, ইউ ডার্টি স্কাম। তুই আমার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়েছিলি! এই নে! এই নে! শপাং–শপাং করে প্রচন্ড শক্তিতে চাবুক কষাতে লাগলেন কর্নেল সাহেব। মায়ের সামনে, বৃদ্ধ পিতার সামনে, স্ত্রীর সামনে জ্বরগ্রস্ত আহত অশক্ত প্রিয়নাথকে চাবুক মেরেছিলেন তিনি–পেশোয়ার আর নেপাল যুদ্ধের ব্রিটিশ বীরপুরুষ নর্থব্রুক। প্রিয়নাথের মা আছড়ে পড়েছিলেন সাহেবের পায়ে, দয়া করো, দয়া করো সাহেব, প্রাণে মেরে ফেলো না ছেলেটাকে, দয়া করো–এই বলে মা মাথা কুটছিলেন। যেন পায়ে একটা শুকনো গাছের ডাল জড়িয়ে গেছে–সেইরকম বিরক্তিতে সাহেব বুটজুতোপরা পায়ে এক লাথি কষালেন মায়ের মুখে–মা ছিটকে পড়ে গেলেন–ফের চাবুক কষাতে লাগলেন শপাং-শপাং।

প্রিয়নাথ একবারও দয়া চাননি, একবারও ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠেননি, শুধু জ্বরের ঘোরে বিকৃত গলায় বার বার বলেছিলেন, মারবে? মারো, কত মারবে? যতই মার-তবু আমি মরব না-রক্তবীজের ঝাড়-আরো মারো-একদিন এর শোধ নেব-সাহেব, প্রতিশোধ নেব-তোমাদের দিন শেষ

দো-তলার জানালা থেকে দেবনাথ দেখছিল। দেবনাথের বয়েস তখন মাত্র পনেরো দাদার সঙ্গে সেও মিছিলে ছিল আগের দিন। প্রিয়নাথের তুলনায় দেবনাথ অনেক শান্ত প্রকৃতির ছেলে-ছেলেবেলা থেকেই নানা অসুখে ভুগেছে বলে তার শরীরে তেমন জোর ছিল না-তবুও ওই বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য দেখে সেও শান্ত থাকতে পারছিল না। কিন্তু তার নীচে যাবার উপায় ছিল না-তাকে একজন জোর করে ধরে রেখেছিল। তাদের বাড়িতে একজন বুড়ো পিসেমশাই থাকতেন-পিসিমা মারা গেছেন, তবু পিসেমশাই আশ্রিতের মতো থেকে গিয়েছিলেন তিনি জোর করে চেপে ধরেছিলেন দেবনাথকে। পুলিশ দেবনাথকেও ধরতে চাইবে, কিন্তু বাড়ির দুটো জোয়ান ছেলেই যদি পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে মা বাবা বাঁচবে কী নিয়ে-এই ভেবে তিনি দেবনাথকে আটকে রেখেছিলেন। অবস্থা যখন চরমে পৌঁছোল-তখন পিসেমশাই জোর করে দেবনাথকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন বাড়ির পিছনের দরজায়, দেবনাথকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে বললেন, যা, পালিয়ে যা, নারায়ণগঞ্জে যা কিংবা যেখানে ইচ্ছে। বোকা ছেলে, আর এক মাসের মধ্যে এবাড়ি আর আসিসনি। শিগগির যা।

দৈত্যের মতন চেহারা নর্থব্রুকের, তার প্রত্যেক চাবুক কেটে কেটে বসছিল প্রিয়নাথের শরীরে। সতেরো ঘা-র বেশি আর সইতে পারলেন না প্রিয়নাথ, তাঁর মাথা ঘাড়ের পাশে ঢলে পড়ল। তারপর পুলিশ সারাবাড়ি লন্ডভন্ড করে সব জিনিসপত্র ভাঙা শেষ করে প্রিয়নাথের হাত বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল থানায়। থানার বারান্দায় কিছুক্ষণ ফেলে রাখা হল তাঁকে-যাতে শহরের সব লোক বুঝতে পারে কর্নেল নর্থব্রুকের সঙ্গে ধৃষ্টতার কী প্রতিফল পেতে হয়। দুপুরের দিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল প্রিয়নাথকে। কিন্তু

হাসপাতালে নেওয়ার দরকার ছিল না। হাসপাতাল থেকে জানানো হল–অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগেই প্রিয়নাথ মারা গেছে।

ঢাকার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে নর্থব্রুককে হত্যা করা হবে। প্রিয়নাথের সমবয়সি তিনজন যুবক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রিয়নাথের আত্মার তৃপ্তির জন্য যতদিন-না নর্থব্রুককে খুন করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়–ততদিন তাঁরা বিছানার বদলে মাটিতে খড় বিছিয়ে শোবেন। কিন্তু নর্থব্রুককে কিছুই করা যায়নি। নর্থব্রুক আর বেশিদিন এদেশে থাকেননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর তখন দেশব্যাপী উত্তেজনার ফলে ব্রিটিশ সরকার কয়েকটা কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের জন্য নর্থব্রুক সরকারের কাছ থেকে সামান্য ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন। কিন্তু এতেই তার মানে আঘাত লাগে, তিনি চাকরি ছেড়ে বিলেতে চলে যান। বিপ্লবী সমিতি ঠিক করেছিল, তাদের একজন সদস্যকে বিলেতে পাঠানো হবে এবং সেখানেই নর্থব্রুককে খুন করা হবে। কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি। একবছর বাদেই খবর আসে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শৃগাল শিকার করতে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন নর্থব্রুক। তখন নর্থব্রুককে সাহায্য করেছিল থানার যে দারোগা–সেই হরিপদ সামন্তর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসবাদীরা। এরপর ঢাকা-চট্টগ্রাম জুড়ে আরও সব এমন ঘটনা ঘটতে থাকে যে প্রিয়নাথের কথা আর অনেকেরই মনে থাকে না। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ওপর আক্রমণ, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা–এর মধ্যে হারিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ, তার একটা ছবিও কোথাও নেই।

দেবনাথকে দেখে কিছুই বোঝা যেত না। রোগা, ছোটোখাটো চেহারা, ফর্সা মুখে শুধু টিকোলো নাকটাই বেশি চোখে পড়ে। খুব শান্তস্বভাবের লোক ছিলেন, শুধু শান্ত নয়–বড়ো বেশি গম্ভীর মানুষ ছিলেন। পারতপক্ষে কোনো কথা বলতে চাইতেন না, লেখাপড়ায় খুব মেধাবী, সংস্কৃত ও অঙ্কে বরাবর ভালো নম্বর পেয়েছেন, কিন্তু এফ এ পাস করার পর আর পড়া হল না। জেলা স্কুলে মাস্টারি নিলেন। প্রিয়নাথকে হারাবার

শোক সামলে উঠলেন মা বাবা কয়েক বছরের মধ্যে, তারপর দেবনাথকেই ওঁরা আঁকড়ে ধরলেন। ছোটো ছেলে অবনীন্দ্রনাথ তখন নেহাই বাচ্চা।

দেবনাথকে দেখে কেউ বুঝতেই পারেনি, তার বুকের মধ্যে সবসময় প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। তাঁর জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, বেঁচে থাকার আর কোনো কারণ ছিল না, তাঁর জীবনটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল ওই প্রতিশোধের সদা জাগ্রত বাসনায়। দেবনাথ শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন।

সুযোগ এল অনেক বছর বাদে। ঢাকার ডি এম হয়ে এসেছিলেন মার্ক উডল্যাণ্ড। অ্যালিস তার বাবার চরিত্র জানে না। মার্ক উডল্যাণ্ড সংস্কৃত শোনায় আগ্রহী ছিলেন ঠিকই; তিনি নেটিভদের সঙ্গে মিশতে চাইতেন, হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেখতে ভালোবাসতেন। কিন্তু নেটিভদের স্বাধীনতা পাবার সামান্য চেষ্টা দেখলেই উগ্রমূর্তি হয়ে উঠতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে, তাদের জীবনে আইন-শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাচ্ছে। এ সত্ত্বেও যেসব ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে তারা নিতান্তই অকৃতজ্ঞ, তারা ভারতেরই শত্রু। স্বদেশিওয়ালাদের প্রতি তিনি ছিলেন নৃশংস, সামান্য ব্যাপারে কঠিন শাস্তি দিতেন, শুধু বন্দেমাতরম উচ্চারণ করার জন্য তিনি বহুলোককে পাঁচ-সাত বছরের জেল দিয়েছেন। অধ্যাপক সতীকান্ত ভট্টশালী যখন থানার সামনে সত্যাগ্রহ করতে গিয়েছিলেন বুটসুদ্ধপায়ে তাঁর মুখে লাথি মেরেছিলেন মার্ক উডল্যাণ্ড। উডল্যাণ্ড যখন কোনো উৎসবে কিংবা পূজাপ্রাঙ্গণে আসতেন–সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। উডল্যাণ্ড কারুর সঙ্গে হেসে কথা বলতে গেলে সে ভয়ে কাঁপত–কথায় কথায় উডল্যাণ্ড কী খুঁত ধরে ফেলবে কে জানে! এক বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় অসুরের মূর্তিটা মিলিটারির মতন করা হয়েছিল–উডল্যাণ্ড সেটা দেখেই রেগে গেলেন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এই হিসেবে তিনি কর্কশ কণ্ঠে বললেন, তোমাদের ধর্মাচরণে আমি হাত দিতে চাই না-না হলে, এই মূর্তি এখুনি আমি ভেঙে ফেলার হুকুম দিতাম। যাই হোক, পর্দা দিয়ে ওই মূর্তি ঢেকে রেখে পূজা করা হোক।

উডল্যাণ্ডের অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, তখন অনুশীলন সমিতি তাকে খুন করার জন্য পরামর্শ আটতে থাকে। সেসময় এসব কাজের ভার নিতে অনেকেই রাজি ছিল-এমনই ছিল উন্মাদনা। কিন্তু দেবনাথের কথা কারুরই মনে আসেনি। গুপ্ত বিপ্লবীরা দেবনাথের কোনো খবরই রাখত না।

দেবনাথের বয়েস তখন তেত্রিশ। একমাত্র ছেলে তপন জন্মেছে চার-পাঁচ বছর আগে। প্রিয়নাথের ভাই বলে তাঁকে মনেই হয় না। ইস্কুলে মাস্টারি করেন আর বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকেন-কোনো রাজনৈতিক দলে কিংবা সভাসমিতিতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর অনেকদিন কেটে গেছে। এতকাল ধরে মনের মধ্যে ক্রোধ ও হিংসার দাহ পুষে রাখা কষ্টকর। দেবনাথ ভোলার চেষ্টা করেছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে মনে নিবৃত্তি আনার চেষ্টা করেছিলেন, বছর কয়েক আগে গান্ধীজির শিষ্যত্ব নিয়ে অহিংসাব্রতে বিশ্বাসী হতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হয়নি, বার বার মনে পড়েছে সেই দৃশ্য- দেয়ালে ঠেসে ধরা প্রিয়নাথকে চাবুক মারছে নর্থব্রুক-আর জ্বরতপ্ত, এক চোখ অন্ধ প্রিয়নাথ চিৎকার করছেন, মারবে? আরও মারো! আমি মরব না! আমি প্রতিশোধ নেব।

দেবনাথ নিজেই কৌশল করে-মার্ক উডল্যাণ্ডের সংস্কৃত শেখার বাতিকের কথা জেনে তাঁর কাছে মাস্টারি জোগাড় করেছিলেন, না আকস্মিকভাবেই মার্ক উডল্যাণ্ড দেবনাথকে মাস্টার রেখেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে, বছর খানেক আগে আন্তঃজেলা সংস্কৃত কাব্য প্রতিযোগিতা যখন হয়, তখন দেবনাথ তাতে হঠাৎ অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকেই অবাক হয়েছিল। দেবনাথ কোনোদিনই পুরস্কার কিংবা আত্মপ্রচারের লোভ করেননি। তা ছাড়া, কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল, ব্রিটিশ সম্রাটের প্রশস্তি। ঢাকা জেলায় দেবনাথের রচনাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল, সেই সূত্রে মার্ক উডল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

অ্যালিস ঠিক জানে না, কিংবা ইচ্ছে করেই বীভৎসতা কমিয়ে নরম করে বলেছে। পিস্তল ছিল না, পিস্তল কোথায় পাবেন দেবনাথ, সে-আমলে একটা পিস্তল জোগাড় করা বড় সহজ কথা ছিল না। একটা ন-ইঞ্চি ছুরি দেবনাথ রোজ আচকানের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যেতেন। ফিতে বাঁধা আচকান এবং মুগার একখানি চাদর ছিল দেবনাথের প্রত্যেক দিনের

পোশাক। কিন্তু সাড়ে চার মাস ধরে প্রত্যেকদিনই আঘাত হানার সংকল্প নিয়ে গিয়েও কিছু না করে ফিরে এসেছেন। মার্ক উডল্যাণ্ড তখন ঢাকা জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের এক নম্বর শত্রু দলে দলে যুবকদের তিনি জেলে পুরে রাখছেন। কিন্তু দেবনাথ সারাজীবনে একটা পাখিও মারেননি, পাঁঠাবলির দৃশ্য দেখে একবার এমন কষ্ট পেয়েছিলেন যে, সারাজীবনে আর মাংসই খাননি। সেই দেবনাথ ছুরি সঙ্গে নিয়ে গেলেও ছুরি চালাবার ঠিক মুহূর্তটা কিছুতেই খুঁজে পেতেন না। মার্ক উডল্যাণ্ড অবশ্য তাঁর সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করতেন সংস্কৃত শেখায় সত্যিই আগ্রহ ছিল, তবে ভাবখানা অনেকটা এইরকম ছিল, যেন সংস্কৃত শিখে তিনি ভারতবর্ষকে ধন্য করে দিচ্ছেন। কথায় কথায় বলতেন, নেটিভরা আমায় কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারে না, আই নো অল অ্যাবাউট দেম।

জেলা হাই স্কুলের সামনে ট্রেজারির গাড়ি লুঠের চেষ্টা হয় সেই সময় একদিন। গাড়ির সঙ্গে দু-জন সঙ্গিনধারী প্রহরী ছিল, তাদের আক্রমণ করে মুখোশপরা একদল লোক। একজন প্রহরীর বন্দুকও কেড়ে নিয়েছিল তারা কিন্তু বোঝাই যায় তারা বন্দুক চালাতেও জানে না- শেষপর্যন্ত টাকা লুঠ করতে পারেনি। তবু পুলিশি অত্যাচারে একটা ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়–সবসুদ্ধ এগারোজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে তিন জন ছিল স্কুলের ছাত্র। আসল অপরাধীদের ধরার জন্য তাদের ওপর কতরকম অত্যাচার করা হচ্ছে–সমগ্র ঢাকা শহর সেই উত্তেজিত আলোচনায় সরগরম। সেদিনও দেবনাথ পড়াতে গিয়েছিলেন উডল্যাণ্ডকে। কুমারসম্ভব-এর শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন, পাইপ মুখে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন উডল্যাণ্ড, হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে মৃদুস্বরে দেবনাথ বললেন–সাহেব, স্কুলের ছেলেদের ওপর যারা অত্যাচার করে, তাদের কি আত্মা আছে?

মুখের হাসিটুকু না সরিয়েই সাহেব বলেন, স্কুলের ছেলে বটে, দে আর ইয়ং ডেভিলস।

কিন্তু সবাই জানে, ওরা নির্দোষ।

যদি নির্দোষ হয় খুব ভালো কথা। কিন্তু তাহলে, যারা আসল কালপ্রিট, তাদের নাম ওরা বলে দিচ্ছে না কেন? জান পন্ডিত, ব্রিটিশ শাসন তোমাদের কতখানি উপকার করছে–তা

তোমার দেশের সব লোক যদি বুঝত-তাহলে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারতুম। ভেবে দেখো, আমরা আসার আগে তোমাদের কতখানি দুরবস্থা ছিল, আইন-শৃঙ্খলা ছিল না, শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু ছাত্রদের বিনাবিচারে আটকে রেখে অত্যাচার করার মধ্যে আইন কিংবা শিক্ষাব্যবস্থার কোনো গৌরব নেই।

ওয়েল, পন্ডিত, লেটস গো ব্যাক টু কুমারসম্ভব–আমি তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। ছাত্রদের এখনো কোনো অত্যাচার করা হয়নি। কাল কয়েক ঘা চাবুক খেলেই সুড়সুড় করে সব বিগ ব্রাদারদের নাম বলে দেবে!

হয়তো চাবুক মারার কথাতেই দেবনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন। মনে পড়েছিল প্রিয়নাথের রক্তাক্ত মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে দেবনাথ গর্জন করে বলেছিলেন, না, চাবুক মারবে না, কিছুতেই মারবে না–।

মার্ক উডল্যাণ্ড একটুও বিচলিত না হয়ে এক ধমক লাগিয়ে দিলেন, শাট আপ। ব্লাডি ফুল, ডোন্ট রিস্ক ইওর নেক।

দেবনাথ এক ঝটকায় চাদর খুলে ফেলে ছুরি হাতে রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন সোজা হয়ে।

ঘরে আর একজন উপস্থিত ছিল, মার্ক উডল্যাণ্ডের জহুরি ব্রজ হালদার। বুড়ো ব্রজ হালদারই পরে সবাইকে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিল। ব্রজ হালদার বলতে বলতে শিউরে উঠত, উঃ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না সে দৃশ্য! অমন ঠাণ্ডা ছেলে দেবনাথ, মুখ তুলে কথাটা বলতে জানত না, হঠাৎ সে কী চেহারা তার। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটা, হাতে লকলক করছে ছুরি। যেন প্রিয়নাথের আত্মা এসে ভর করেছিল তার ওপর। সেই ছুরি দেখে সাহেব যত না ভয় পেয়েছিল, তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিল দেবনাথের সেই চেহারা দেখে। দেবনাথ চেঁচিয়ে শুধু বলেছিল, না–পারবে না, না, না, না–।

মার্ক উডল্যাণ্ড হাত তুলে বাধা দেবার আগেই দেবনাথ ছুটে এসে তাঁর পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লেগেছিল তার গায়ে, সেই অবস্থাতেও উডল্যাণ্ড সাঁড়াশির মতন দু-হাতে গলা টিপে ধরেছিলেন দেবনাথের। দেবনাথ ছুরিটা টেনে বার করে আবার চালাতে লাগলেন এলোপাথাড়ি ভাবে, কতবার ছুরি মেরেছিলেন তার ঠিক নেই উডল্যাণ্ডের পেট বুক ফালাফালা করে ফেলেছিলেন–তখনও তাঁর গলায় উডল্যাণ্ডের দু হাত চেপে ধরা। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ব্রজ হালদার ভয়ে পালিয়ে যায়। সেই বীভৎস নারকীয় দৃশ্য অ্যালিস দেখেছে কি না কে জানে, শুনেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অ্যালিস নরমভাবে কমিয়ে বলেছে। মৃত মার্ক উডল্যাণ্ডের দু-হাত গলা টিপে ধরেছিল দেবনাথের, সেইজন্য দেবনাথ পালাতে পারেননি। কিছুতেই গলা থেকে সেই কঠিন মুঠি ছাড়াতে পারেননি–সেই অবস্থায় সাহেবের আর্দালিরা পিছন থেকে বাঁশ দিয়ে পেটায় দেবনাথকে–শেষ মুহূর্তে দেবনাথ নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। সম্পূর্ণ সফল হননি, তারপরেও তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় বেঁচে ছিলেন হাসপাতালে। তিন দিন তিন রাত্রি ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক জেগে অপেক্ষা করেছিল হাসপাতালের বাইরে–দেবনাথের খবর জানার জন্য। দেবনাথের আর জ্ঞানে ফেরেনি।

অ্যালিস নিজের ছেলেবেলার দুঃখের কথা বলছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বসে সে কত আর দুঃখ পেয়েছে; যদি জানত তপনের ছেলেবেলার কথা! দেবনাথের ঘটনা শোনামাত্রই তাঁর বাবা-মা আর শোক করারও সময় পাননি, তক্ষুনি সপরিবারে ঢাকা শহর ছেড়ে পালিয়েছিলেন। দুই ছেলে গেছে, আর একটি মাত্র ছেলে বেঁচে-সে তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র–পুলিশ তাকে ছাড়বে না। কোথাও আশ্রয় পাননি তখন, মাসের পর মাস–

সমস্ত মুখখানা কুঁকড়ে গিয়েছিল তপনের। চোখ দুটো জ্বালা করছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে সিঙ্কের কাছে গিয়ে কল খুলে চোখ-মুখ ধুল। ঢকঢক করে জল খেল পুরো এক গ্লাস। একটা সিগারেট ধরাল, টানতে ভালো লাগল না, ফেলে দিল। কিন্তু কেন এইসব। দুঃখের কথা তার আবার মনে পড়ল; এই উনিশ-শো পঁয়ষট্টি সালে, লণ্ডনের

এই শীতের রাতে। তপন তো সব ভুলে গিয়েছিল! সে তো আর এইসব দুঃস্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে চায়নি।

ঢাকা থেকে পালিয়ে ওরা গিয়েছিল মৈমনসিং-এ, মুক্তাগাছার জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন ঠাকুরদার বৈমাত্রেয় ভাই। ওরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভরসা পাননি–এ-রকম একটা পরিবারকে বাড়িতে রেখে তিনি পুলিশের বিষ নজরে পড়তে চাননি–ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, মা, কাকা আর তপন–তখন তপন নেহাৎই শিশু-তবু যেন তার সব কথা মনে আছে, মাসের পর মাস তারা হন্যে হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয়স্বজনের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করেছে, কোথাও জায়গা পায়নি–সামান্য যা টাকাকড়ি ঠাকুরদা সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন–তা দু-এক মাসেই ফুরিয়ে যায়–বরিশাল শহরে এক মন্দিরের চত্বরে দু-তিন দিন থাকতে হয়েছিল ভিখারি পরিবারের মতন–ঠাকুমার তখন ঘন ঘন ফিট হত। শেষপর্যন্ত ওরা এসে ঠেকল কলকাতায়। ঠাকুমার এক ভাই খুব বড়োলোক ছিলেন–তিনি দয়া করে থাকতে দিলেন বাড়ির এক কোণে। ঠাকুরদার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, ঠাকুমার ফিটের অসুখ–একমাত্র মা-ই খুব শক্ত ছিলেন–তিনিই ওদের সবাইকে সামলে রাখলেন কোনোরকমে–সেই বাড়িতে মা ঝি-গিরি করেছেন বছরের পর বছর তপন এখনও স্পষ্ট দেখতে পায়–ভবানীপুরে সেই চকমেলানো বাড়ির উঠোনের এক কোণে বসে মা ডাঁই-করা বাসন মাজছেন–তাঁর ফর্সা সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে আর বারান্দায় ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বই-শ্লেট নিয়ে পড়তে বসে তপন অনবরত ঘ্যানঘ্যান করে কেঁদে মাকে জ্বালাতন করছে। মা-র বয়েস তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর-কিন্তু অল্প বয়েসেই বুড়ি হয়ে গিয়েছিল মা-ঠাকুমা আর মাকে দেখাতে দুই বোনের মতন। তপনের কাকা অবনীনাথ তখন একুশ বছরের যুবক-ডাক্তারি পড়তে পড়তে ছেড়ে আসতে হয়- কলকাতায় আবার মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হবার কোনো সামর্থ্য ছিল না। তিনি চুপিচুপি শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে কুলিগিরি করে পয়সা রোজগার করতেন। তাঁর দুই দাদার পরিণাম দেখে অবনীনাথ আর ওই মারাত্মক পথে পা বাড়াননি–তিনি শুধু চাইতেন- কোনোক্রমে উপার্জনের পথ খুঁজে পরিবারের সকলকে বাঁচাতে।

শিয়ালদা স্টেশনে তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে ফেলে একদিন ঠাকুরদা বাড়ি ফিরে কী কান্না কেঁদেছিলেন!

না, তপন আর ওসব ভাবতে চায় না! কিছুতেই ভাববে না। তার সঙ্গে তো সব সম্পর্ক চুকেই গেছে। সে আর দেশে ফিরবে না-আবার তো যাচ্ছে নিছক বেড়াতে-তার বাবা নেই, মা নেই, দেশ নেই, সুতরাং অতীতেরও কোনো মূল্য নেই আর! সে এখন নিঃসঙ্গ-তার কাছে মানুষের কোনো জাত নেই-সব মানুষই তার কাছে সমান-তবু লণ্ডনের একটি সাধারণ মেয়ের ঘরে কেন চোখে পড়ল ওই ছবি--কেন তাকে জিজ্ঞেস করতে হল, ওই ছবি কার!

আঃ, অসহ্য লাগছে তপনের। ঘুমের ওষুধ খেয়েও একছিটে ঘুমের দেখা নেই। বেড সাইড টেবলটার ড্রয়ার খুলে তপন আবার একটা হুইস্কির বোতল বার করল।

.

০৪.

পরদিন বিকেল বেলা অ্যালিসের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু তপন গেল না। সেদিন সারাদিন হোটেল থেকে বেরোলই না। সকাল নটা আন্দাজ ঘুম ভেঙেছিল-কিন্তু বিছানা থেকে ওঠেনি, মুখ ধোয়নি, দাড়ি কামায়নি-রুম সারভিসের টেলিফোন তুলে বেকন-টোস্ট মার্মালেড পোচ আর এপ্রিকটের রস আনিয়ে নিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সেগুলো খেল -মাথা এত ভারী যে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তপন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এমন গভীর লম্বা ঘুম হল তখন যে দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াই হল না।

দুপুর পেরিয়ে বিকেলের কাছাকাছি এসেও ঠিকমতন ঘুম ভাঙল না-এক-একবার চোখ মেলে আচ্ছন্ন অবস্থায় একটু তাকিয়ে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়তেই ভালো লাগছিল। নেশার মতন ঘুম-এ নেশা ভাঙতে ইচ্ছে করে না-এ নেশায় কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই-অন্য কোনো নেশায় তপন এত তৃপ্তি পায়নি কখনো।

প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি বিছানা ছেড়ে উঠল তপন। মুখ থেকে অ্যালকোহলের বিশ্রী স্বাদটা কেটে গেছে-পেটের ঠিক মাঝখানে খিদের জ্বালা থাকায় শরীরটা বেশ দুরস্ত লাগছে। মাথার ওপর দু-হাত তুলে তপন দু-চার বার লঘু ব্যায়াম করে নিল। গতকাল রাত্রের সব ঘটনাই যেন সে ভুলে গেছে এমনকী অ্যালিসের কথাও তার মনে পড়ছে না। তপন হঠাৎ ঠিক করে ফেলল আজ সে খুব সাজগোজ করবে। দুটো কল খুলে ঠাণ্ডা আর গরম জল মিশিয়ে বাথটবটা ভরতি করতে লাগল কুসুম-কুসুম জলে। ততক্ষণে দাঁত মেজে নিল ভালো করে। নতুন ব্লেডে দাড়ি কামাল।-আমেরিকায় তার শেষ বান্ধবীর নাম ছিল আইরিন-বিদায়ের দিন সে তপনকে একটা আফটার-শেভ লোশন উপহার দিয়ে বলেছিল-এটা যখন তুমি গালে মাখবে- তখন আমার কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে তোমার। সেটা আজই প্রথম খুলল তপন গন্ধটা এত সুন্দর-যেন হালকা কুয়াশার মতন সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ল গন্ধটা তপনের মনটা তাতে খুশি হয়ে গেল। ভাবল, আইরিন মেয়েটা সত্যিই খুব ভালো ছিল- ওকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললেই হত চোখ-কান বুজে। বাথটবে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে বসে থেকে সাবানের ফেনা নিয়ে খেলা করতে লাগল ছেলেমানুষের মতন।

শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে তপন বেশ সময় নিয়ে চুলে ক্রিম মেখে পরিপাটি করে আঁচড়াল। সুটকেশ খুলে তার সবচেয়ে দামি ধপধপে সাদা সার্টটা বার করল, নিখুঁত ভাঁজের ট্রাউজার্স ও জ্যাকেট, এমনকী মুক্তো বসানো বোতাম ও টাইপিন নিল, মোজা ও টাইয়ের রং মেলাবার জন্য অনেকক্ষণ বাছাবাছি করল। জুতো পালিশ করার জন্য কাল রাত্রে দরজার বাইরে জুতো রাখতে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু তপনের কাছে আমেরিকা থেকে আনা ইনস্ট্যান্টপালিশ ছিল-সেই কাগজ জুতোয় ঘসে নিতেই জুতো ঝকঝকে হয়ে গেল।

পুরো পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে তপন। টাইয়ের গিট সঠিকভাবে মাঝখানে পয়েছে-চুল নিপাট, পোশাকে কোনো খুঁত নেই, শরীরে একটুও জড়তা নেই। নিজের দিকে তাকিয়ে তপন একটু হাসল। সাজগোজের আরও বাকি আছে। আবার সুটকেশ খুলে প্যারিসের বিখ্যাত বসন্ত নামের দোকানের আরও বিখ্যাত কালো বিড়াল নামে সেন্টের

শিশিটা বার করে জামার কলারে আর রুমালে ঢেলে নিল একটু। রুমালটার ত্রিকোণ ভাঁজ গুঁজল বুক পকেটে। আজ রেনকোট নিলে বড়ো জবড়জং দেখাবে। না, আজ রেনকোট থাক–তার বদলে খুব সরু করে পাকানো স্মার্ট চেহারার স্টিলের ছাতাটা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে খাঁটি ফুলবাবুর মতন লঘুচিত্তে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল তপন। এমনকী সে আলতোভাবে শিষ দিচ্ছে পর্যন্ত।

পিকাডেলি সার্কাসে এরসের মূর্তির কাছে অ্যালিসের দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল। সেসময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, তবু তপন সেদিকে গেল না, উলটো দিকে, অক্সফোর্ড সার্কাস ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবিলম্বে পৌঁছে গেল হাইড পার্ক কর্নারে। সেখানে খুব বক্তৃতার তোড় ছুটেছে। খিদেয় চন চন করছে তপনের পেট, তবু তক্ষুণি তার খেতে ইচ্ছে করল না। ইচ্ছে করেই খিদেটা জিইয়ে রাখছিল, খিদের সময় শরীরটা খুব হালকা লাগে। বক্তৃতা শুনলেই তপনের খিদে আরও বেড়ে যায়–তাই তপন একটু সেখানে দাঁড়াল ভিড়ের মধ্যে।

তিন জন বক্তাকে কেন্দ্র করে তিনটে গোল ভিড়। তপন প্রত্যেকটাই একটু একটু করে শুনল–এক জন ধর্ম নিয়ে খুব মাতামাতি করছে–বেঁটে, খুব গোল চেহারার টাক মাথার বক্তাটি বোঝাতে চাইছে পৃথিবীতে রবিবারের বদলে শনিবারই পূর্ণ ছুটির দিন হওয়া উচিত–কারণ শনিবার আসল সাবাথ ডে। যিশু সেইদিনেই। তপনের মনে হল লোকটি বদ্ধ পাগল। আর এক জায়গায় একটি আফ্রিকান ছেলে চোস্ত ইংরেজিতে ব্রিটিশ জাতটার বাপ-মা তুলে গালাগাল দিচ্ছে। তপন সে-বিষয়েও কোনো উৎসাহ বোধ করল না। অতই যদি তোর স্বদেশপ্রেম আর ব্রিটিশদের ওপর রাগ–তাহলে এদেশে পড়ে আছিস কেন? যা না দেশে ফিরে? তপনের কোনো দেশ নেই–সে ও বিষয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না। তৃতীয় বক্তা কী বলছে সেটা বোঝার আগেই তপন বাধা পেল।

একটু দূরেই দুটি বাঙালি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে তপনকে লক্ষ করছিল। ওদের মুখ আর কাঁধের আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় যে ওরা এদেশে নতুন এসেছে। এখনও চালু হয়ে ওঠেনি। ওরা তপনের দিকে চোখাচোখি করছিল, তপন চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল বারবার। এইসব ছেলেদের তপন খুব ভালোভাবেই চেনে। তার একটুও ভালো লাগে না

এদের সঙ্গে মিশতে। বাঁধাধরা এদের কথাবার্তা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি বাঙালি? যেন বাঙালি হলেই হাতে স্বর্গ পাবে। তারপরই জিজ্ঞেস করবে পরপর প্রশ্ন– কবে এসেছেন? পড়ছেন না চাকরি? তাদের অফিসে কালার কমপ্লেক্স আছে কি না! ভারতীয় বলে বাড়িভাড়া পেতে অসুবিধে হয়েছে কি না। কত ভাড়া তাও জেনে নেবে। কতদিন ইলিশ মাছ কিংবা ভাত খাইনি বলে হা-হুঁতাশ করবে-অথচ প্রায়ই পাকিস্তানি হোটেলগুলোতে মাছ-ভাত খেতে যায়। আর দাদা, বাংলা কথা বলতে না পারলে দম আটকে আসে–আপনার কাছে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড আছে? দৈনিক পত্রিকা রাখেন? বাংলা বই-টই কিছু আসে?

তপনের এসব একটুও ভালো লাগে না। বাঙালি কী রাজস্থানি কী মিশরি কী ইংরেজ এতে তার কিছু আসে-যায় না- সে শুধু জানতে চায়–মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সে আনন্দ পাযে কি না। শুধু বাঙালি বলেই কিংবা নিছক বাংলায় কথা বলার জন্যই সে বিদেশে এসে একজন মূর্খ কিংবা বদরসিকদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। তা ছাড়া, তপন ভাবে, সে বাঙালি কিনা তাতে কী আসে-যায়–সে বাংলাদেশ ছেড়েছে জন্মের মতন, তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বন্ধন নেই, সারাজীবন সে থাকবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। এখন আর, সে কোথায় জন্মেছে কিংবা কোথা থেকে এসেছিল এগুলো অবান্তর–বাংলাদেশ বা আফ্রিকা-কোনো তফাত নেই। এখন সে ইচ্ছে মতন বন্ধু বেছে নেবে। বাঙালি খোঁজার তার কোনো দরকার নেই। কিন্তু তার চেহারাটা বদলানো যাবে না কিছুতেই-যেখানে-সেখানে ওই প্রশ্ন শুনতে হবে, আপনি কি বাঙালি? আর কোথায় নেই, এই রক্তবীজের ঝাড় বাঙালিগুলো?–সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। মেক্সিকোয় একটা ছোট্ট শহরেও তপন দেখেছিল–এক বাঙালি ডাক্তার বাসাবেঁধে আছে-সতেরো বছর ধরে আছে –মেক্সিকান মেয়ে বিয়ে করে ঘরভরতি ছেলেপুলে নিয়ে পুরোপুরি ল্যাটিন বনে গেছে– তবু তপনকে দেখে তার বাংলাদেশের জন্য শোক উথলে উঠেছিল, সেই এক প্রশ্ন, আপনি কি বাঙালি? কতদিন বাংলায় কথা বলিনি। সেই একই ইলিশ মাছ আর রবীন্দ্রসংগীতের জন্য হা-হুঁতাশ। ওদের কিছুতেই এড়াতে পারবে না তপন, যদি-না নিজের চেহারাটা বদলাতে পারে। এই লণ্ডনেও তাকে পদে পদে ওদের সামনে পড়তে হবে, এমনকী নিজে

থেকেই দেখা করতে হবে কয়েকজনের সঙ্গে-কাকা লিখেছেন, তাঁর এক বন্ধুর ছেলে এখানে এসে নাকি বকে গেছে-বাড়িতে কোনো চিঠিপত্র লেখে না-তার খোঁজ নিতে হবে তপনকে। আর দিবাকর, ওর সঙ্গে সায়েন্স কলেজে পড়েছে, রিসার্চ করেছে অনেক বছর একসঙ্গে তার সঙ্গেও দেখা না করে পারা যাবে না।

ছেলে দু-টি তপনের কাছে এগিয়ে এসে প্রথমে ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করল, মাপ করবেন আপনি কি বাঙালি? ঠিক মনে হচ্ছে-

তপন মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল। প্রশ্ন শোনার পরও এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল যেন সে ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারেনি। ছেলে দু-টি ওই কথা আবার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করতেই তপন ইচ্ছে করেই জিভটা খানিকটা মোটা করে বলল, আর যু আস্কিং মিঃ নো। আমি আসছি সিংহল থেকে। আমি একজন সিংহলী।

ছেলেটি থতোমতো খেয়ে বলল, মাপ করবেন। মাপ করবেন। আপনাকে দেখে আমাদের ভুল হয়েছিল-আপনাকে ঠিক বাঙালির মতন দেখতে।

তপন বিনীত ও চওড়া হাস্যে বলল, বাঙালি হতে পারলে নিশ্চয়ই আমি খুশি হতুম। কিন্তু আমি বাংলাদেশ কোনোদিন চোখেই দেখিনি। শুনেছি খুব সুন্দর আপনাদের দেশ। আপনারা কি ক্যালকাটা থেকে আসছেন?

ছেলেটির কিন্তু আর কথা বলার কোনো উৎসাহ নেই। বাঙালি না হলে আর কথা বলে সময় নষ্ট করবে কেন? ওরা দু-একটা হুঁ-হাঁ করে সরে পড়ল।

তপন আর সেখানে দাঁড়াল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোহো স্কোয়ারের একটা স্প্যানিশ হোটেলে এসে পেট ভরে ডিনার খেল। স্প্যানিশদের ঝাল ঝাল রান্না খেতে ওর ভালো লাগে। দামের জন্য পরোয়া না করে তপন ওয়াইন দিয়ে সিদ্ধ করা শামুকেরও অর্ডার দিয়ে দিল। হোটেলটা বেশ বড়ো। একা একা খেতে এলে তপন বেশ বড়ো হোটেল কিংবা কন্টিনেন্টাল হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও যায় না। ছোটোখাটো ব্রিটিশ রেস্তোরাঁয় গেলে

অপমানিত হবার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক হয়তো ঢুকতে বাধা দেবে না-কিন্তু ওয়েটাররা অবহেলা করবে, ডাকলেও শুনবে না, আশেপাশের লোকগুলো সরু চোখে তাকাবে। তপনের তখন ভয়ংকর রাগ হয় অথচ কিছুই করার থাকে না।

খেতে খেতে একটা কথা ভাবছিল তপন। আজ থেকে দশ বছর বাদে, যখন সে পুরোপুরি আমেরিকান নাগরিক হয়ে যাবে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে তার কাছে থাকবে আমেরিকান পাসপোর্ট-তখন এই লণ্ডনে সে বেড়াতে এলে তাকে কেউ আমেরিকান বলে মানবে? ওই লালমুখো লম্বাচওড়া দৈত্যগুলোকে ডলারের জন্য সবাই খাতির করে-তার পকেটেও ডলারের গোছা থাকলে কি তাকেও সমান খাতির করবে? ক্যালিফোর্নিয়ায় তার একজন অধ্যাপক, ইয়োতো নিশিমা-জাপান ছেড়ে এসেছেন একত্রিশ বছর আগে পুরোপুরি আমেরিকার নাগরিক-ওখানে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে-তবু কেউ তাঁকে আমেরিকান বলে না-সবাই জাপানি বলে। দক্ষিণ কোরিয়ায় একবার তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন-সেখানে ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়-তিনি আমেরিকান বলে নয়, জাপানি বলে। দক্ষিণ কোরিয়া এখন আমেরিকার তাঁবেদার হয়েছে, কিন্তু জাপানের ওপর রাগ ভুলতে পারেনি। তপন বুঝতে পারল, তারও সারাটা জীবন ছন্নছাড়া হয়েই কাটবে পুরোনো পরিচয় হারাবে কিন্তু নতুন পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা পাবে না, স্বদেশ ছাড়বে কিন্তু আর অন্য কোনো দেশই স্বদেশ হবে না। তা হোক, সে ওসব গ্রাহ্য করে না-স্বদেশপ্রেম কিংবা স্বাজাত্যবোধ-ওসব নিছক ভাবালুতা।

হোটেলের খাবারগুলো প্রত্যেকটাই সুস্বাদু, তবু তপনের ঠিক তৃপ্তি হল না। এইরকম কোনো বিশাল শহরের হোটেলে একা বসে ডিনার খেতে কীরকম যেন অস্বস্তি লাগে। মনে হয় যেন, আশেপাশের সব টেবিল থেকেই তাকে লক্ষ করা হচ্ছে। সবাই মনে মনে বলছে, আহা, লোকটা একা। অন্য কোনো টেবিলে কেউ একা বসে নেই।

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার পরই দেখল আবার বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে তপনের আবার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল। সরু করে পাকানো ছাতাটাকে ছড়ির মতন নিয়ে হাঁটতে ভালো লাগে, কিন্তু খুললেই বিশ্রী, তার ওপর ভেজা ছাতা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার,

যখন তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি লেগেই আছে। লণ্ডন আর একটুও ভালো লাগছে না। টেডের কথা শুনে কেন যে সে লণ্ডনে আসতে গেল। প্যারিস থেকে সোজা জেনিভায় চলে গেলেই হত। এই নাকি সুইংগিং লণ্ডন! পাঁচ বছর আগে দেখা লণ্ডনকে এখন তার আরও নোংরা আর জঘন্য লাগছে। প্যাঁচপেঁচে রাস্তা, লোকগুলোর মুখ আরও গোমড়া হয়েছে, মেয়েগুলো আরও বেহায়া, সবসময় ছাই রঙের আকাশ, লাল ইটের একঘেয়ে বাড়িগুলোর ওপর ময়লা ছায়া। আগে এরা গর্ব করে বলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না। এখন তপনের মনে হচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও সূর্য ওঠেই না। দৈবাৎ লণ্ডনের আকাশে রোদ উঠলে এরা হাভাতের মতো তাই নিয়ে আহ্লাদ করে। রাস্তায় কালো সুট পরা মানুষের শোভাযাত্রা—সবসময় ব্যস্ত, মুখ দেখলে মনে হয়-ওরা এইমাত্র কোনো শোকসভা থেকে ফিরল। মাঝে মাঝে এক-একটা মানুষের মুখ ভরতি অহংকার। ওসব মুখ দেখলে হঠাৎ তপনের মাথায় খুন চড়ে যায়। ফোতো কাপ্তেন সব, তবু অত অহংকার কীসের?

একটাই ভালো জিনিস লণ্ডনের, ঘন ঘন ট্যাক্সি পাওয়া যায়। ট্যাক্সি ডেকে তপন তার ট্রাভেল এজেন্টের অফিসের দিকে চলল, যদি টিকিট পাওয়া যায়-কাল-পরশুই সে রোম কিংবা মিউনিখে চলে যাবে। আর একদিনও এখানে থাকার ইচ্ছে নেই তার।

ট্রাভেল এজেন্সি তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর সারা সন্ধ্যে ও অনেক রাত পর্যন্ত তপন একা একা ঘুরল। টেড থাকলে তার সঙ্গে আড্ডা মারা যেত, কিন্তু টেড এখন লণ্ডনে নেই, তপনের কিছুই করার নেই। রাস্তায় এত মানুষ-তবু এর মধ্যে তপনের নিঃসঙ্গতাবোধ আরও বেড়ে যায়। এক পাব থেকে আরেক পাব বদলেও তার মন ভালো হল না। এমনকী স্ট্রিপটিজ নাচ দেখে সময় কাটাতে গিয়েও একটু বাদে বিরক্ত হয়ে উঠে এল।

হোটেলে ফিরল অনেক রাত্রে। অ্যালিস বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল তার জন্য। চলে গেছে একটু আগে প্রচুর বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে চিঠি লিখে রেখে গেছে-কী ব্যাপার তপন? আমি পিকাডেলিতে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলুম, তুমি এলে না। আমি ভাবলুম, তোমার শরীর খারাপ, তাই হোটেলে এলুম, তুমি নেই। কোনো মেসেজ রেখেও যাওনি। এত রাত্রেও

ফিরলে না। কী? হঠাৎ কোনো জরুরি কাজ? আমি বাড়িতে থাকব-ফেরা মাত্র ফোন কোরো। আমিও চেষ্টা করব তোমাকে টেলিফোন করতে। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে, একদম ভালো লাগছে না। ইতি অ্যালিস। পুনশ্চ: অনেকগুলো চুমু ও ভালোবাসা। আবার অ্যালিস!

অ্যালিসের চিঠিটা তপন বার দুয়েক পড়ল। তপনের সঙ্গে অ্যালিসের বেশি ঘনিষ্ঠতা অ্যালিসের প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবরা ভালো চোখে দেখেনি। যেসব ব্রিটিশ মেয়ে একবার কোনো ভারতীয় বা আফ্রিকান ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে-তারা মার্কামারা হয়ে যায়, আর কোনো ব্রিটিশ ছেলে সেইসব মেয়েকে পাত্তা দেয় না। যেসব ব্রিটিশ মেয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক পায়তারা কখনো কোনো আফ্রিকার কালো ছেলেদের দিকে ফিরেও তাকায় না। অ্যালিসের একবার ডিভোর্স হয়ে গেলেও এখনও সে যথেষ্ট সুন্দরী-মোটামুটি ভালোই চাকরি করে এবং একা নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে থাকে-সুতরাং তার প্রতি তার নিজের জাতের ছেলেদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক।

অ্যালিসদের লাইব্রেরির একজন ছোকরা অ্যাকাউন্ট্যান্ট কয়েকদিন অ্যালিসের সঙ্গে ডেট করেছিল-অ্যালিস নিজেই বলেছে যে আগে প্রতি শনিবার সে সেই ছেলেটির সঙ্গে বাইরে সিনেমা দেখেছে ও ডিনার খেয়েছে। কেনসিংটনে একদিন অ্যালিস ও তপন পাশাপাশি যাচ্ছিল-সেসময় সেই ছেলেটি মুখোমুখি পড়ে। ছেলেটি ভাবতেই পারেনি যে তপন অ্যালিসের সঙ্গে আছে-তপনকে সে ভেবেছিল অন্য একজন-সে উদ্ভাসিত মুখে ডেকেছিল, অ্যালিস। অ্যালিস কিন্তু তেমন কোনো উত্তেজনা দেখায়নি। নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, হ্যালো ডনাল্ড। আলাপ করিয়ে দিচ্ছি-মিট মাই ফ্রেণ্ড টপন রায়চৌদ্রি-হি ইজ আ সায়েন্টিষ্ট, আর এ হচ্ছে আমার অফিসের কলিগ মি. ডনাল্ড স্মার্ট। ডনাল্ড তপনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুখখানা তার নিভে গিয়েছিল খানিকটা বিমূঢ় অবস্থা তার-অ্যালিসের সঙ্গে তপনের বন্ধুত্ব যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে অ্যালিসের সঙ্গে নীচু গলায় দ্রুতবেগে কিছু কথা বলতে লাগল-তপন সব কথা বুঝতে পারেনি-কিন্তু এটুকু বুঝেছিল যে ছেলেটি তার সম্পর্কেই প্রশ্ন করছে।

মাঝে মাঝেই ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে ছেলেটির। ছেলেটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুদূর আসার পর তপনই কৌতুকভরে অ্যালিসকে বলেছিল, ইস, মি. স্মার্ট খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। তুমি ওকে বাদ দিয়ে একজন কালার্ড ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে ঘুরছ।

অ্যালিস বলেছিল, যাঃ, ও কথা বোলো না! ডনাল্ডকে আমার ভালো লাগে না। ওর সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, ওর সঙ্গে আমি কথা বলার বিষয় খুঁজে পাই না! কোথায় কোন জিনিসটা সস্তা–ডনাল্ড এসব খুব খোঁজ রাখে। কীরকম ভাবে ইনসিওরেন্স করলে বেশি লাভ হয়, কী করে ইনস্টলমেন্টে বাড়ি কেনা যায়–ও এসব নিয়েই কথা বলতে ভালো পারে, আমার দিনরাত ওসব ভালো লাগে না। তার চেয়ে তোমার কালারফুল কথাবার্তা শুনতে আমার দারুণ ভালো লাগে।

আমি আর কী কথা বলি? আমি তো শুধু বকবক করি।

তা হোক। তোমার মধ্যে একটা রহস্য আছে, অনেক ছেলেদের মধ্যেই এটা থাকে না। মেয়েরা এটাই খুব ভালোবাসে।

সত্যি! মাইরি বলছ?

অ্যালিস হকচকিয়ে বলেছিল, ওটা আবার কী? ওটা কী শব্দ?

তপন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল, ওটা কিছু না। একটা ইয়ার্কি!

পিকাডেলির ওই ভিড়ের চৌরাস্তায় একা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অ্যালিস, নিশ্চয়ই ঘন ঘন ব্যাকুল উদবেগে তাকিয়েছে। মেয়েদের পক্ষে ওই ভঙ্গিটা ভালো নয়, লোকে অন্যরকম মনে করে–কোনো ভদ্র মেয়ে পথের ওপর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। তপনও লক্ষ করেছে, ঠোঁটে দগদগে লিপস্টিক মাখা কয়েকটি মেয়ে পথের ওপর ঈষৎ কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে–তাদের চোখে চোখ পড়লেই তারা এক চোখ টিপে ইঙ্গিত করে। অনেক লোক তাদের পাশে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে পাশপাশি হাঁটে। অ্যালিসকেও যদি

কেউ ও রকম ভেবে থাকে? হয়তো অ্যালিসের পাশে এসেও কেউ অভদ্র ইঙ্গিত জানিয়েছে, ফিসফিসিয়ে বলছে, হ্যালো সুইটি-মেয়েদের এ-সময়টা দারুণ অসহায় লাগে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তপন ভাবল, লাগুক! তাতে আমার কিছু যায়-আসে না! অ্যালিসের চিঠিটা গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল বাথরুমের দিকে। এবার কী করা যায়? এক্ষুনি শুয়ে পড়ব? সারাদিন ঘুমোবার পর এখন নিশ্চয়ই সহজে ঘুম আসবে না। অথচ, করারও তো কিছু নেই! টেড থাকলে কোনো সমস্যাই হত না।

তপন পুরো পোশাক পরেই কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়-একটা পত্রিকার পাতা ওলটালো, আর ভালো লাগল না। তারপর, অ্যালিস তাকে যেকোনো মুহূর্তে ফোন করতে পারে-এই কথা মনে পড়ায় তপন ধড়মড় করে উঠে বসল। নিজেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে অপারেটরের কাছে একটা নম্বর চাইল। সংযোগ পেয়ে, তপন বেশ কৌতুকের সুরে বলল, হ্যালো? বারবারা? আমি তপন। ঘুমোতে যাওনি নিশ্চয়ই! কী করছিলে? সঙ্গে কেউ নেই! একা? আমারও খুব একা একা লাগছে।

বারবারা খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? হঠাৎ আমাকে এত রাত্রে টেলিফোন?

এমনিই! তোমাদের ল্যাণ্ডলেডি আবার রাত্তির বেলা টেলিফোন এলে বিরক্ত হয় না তো? তোমার ঘরেই টেলিফোন? বা:! চমৎকার! কী করবে এখন? এসো না, বাইরে কোথাও মিট করি দুজনে।

এত রাত্রে? কাল অফিস আছে আমার

হেল উইথ ইওর অফিস! না, না, অফিসে যাবে, ঠিকই যাবে-আজ কিছুক্ষণ একটু একসঙ্গে গল্প করা যাক না-কী আর এমন রাত হয়েছে! রাত্রি তো এখনও যথেষ্ট তরুণী! আসবে?

অ্যালিসের কী হল? অ্যালিস কোথায়?

জানি না।

সে কী? অ্যালিস কোথায় তুমি জানো না?

কী করে জানব? দু-তিনদিন ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। ডনাল্ড না ডেভিড-কী যেন একটা ছেলের সঙ্গে অ্যালিস এখন খুব ব্যস্ত!

যাঃ মিথ্যে কথা বোলো না!

সত্যি বলছি।

শোনো দুষ্টু ছেলে, অ্যালিস আজ লাঞ্চের সময় আমার অফিসে এসেছিল। আমাকে সব বলেছে।

কী বলেছে?

তুমি কি তা শোনার মতন অবস্থায় আছ? খুব বেশি নেশা করোনি তো? আমি ঠিক আছি, তুমি বলো না। অ্যালিস আজ আমার কাছে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। পুয়োর গার্ল, ওর মনটা বড্ড নরম-টপন, তুমি ওর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করছ কেন? বোকা, তুমি দেখতে পাও না -অ্যালিস ওর মাথা-কান জড়িয়ে তোমার প্রেমে পড়েছে? ও সত্যি তোমাকে ভালোবাসে।

ভালোবাসে?

তপন যেন এ-রকম হাসির কথা আর কখনো শোনেনি, হো-হো হা-হা করে বাংলা ইংরেজি দু-রকমের হাসি হাসল অনেকক্ষণ। হাসির চোটে দম আটকে আসছে যেন, সেইরকমভাবে বলল, ভালোবাসে? কী বললে, ভালোবাসে? মাত্র দশদিনের আলাপ,

আর সাত-আট দিন পর আমি চলে যাব–তাও আগে থেকে বলা আছে, এর মধ্যেই ভালোবাসা? সিলিয়েস্ট পসিবল থিং আই হ্যাভ এভার হার্ড!

ইয়ার্কি কোরো না, টপন! সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি চলে না!

আমি মোটেই ইয়ার্কি করছি না। আই অ্যাম সিরিয়াস!

টপন, ভালোবাসা কি কোনো শর্ত মানে? একদিনের আলাপেও কি ভালোবাসা আসতে পারে না?

তুমিও যে এ-রকম ড্যাম রোমান্টিক, আমি তো আগে জানতুম না।

চালাকি কোরো না, তুমি নিজেকে লুকোচ্ছ। সবাই মনে মনে রোমান্টিক।

বল্ডারড্যাস! তুমি আজ রাত্রে আসবে কিনা বলো! জীবন সংক্ষিপ্ত, যেটুকু সময় পাওয়া যায়, সেটুকু সময় উপভোগ করে নেওয়াই তো ভালো।

না, আমি যেতে পারি না–অ্যালিস আমার বন্ধু, সত্যিকারের বন্ধু। আমি সত্যিই ওর জন্য অনুভব করি। আমি ওর মনে কোনো আঘাত দিতে চাই না।

এতে আঘাত পাবার কি আছে? তুমি আজ রাত্তিরে আমার সঙ্গে একটু গল্প করলে অ্যালিস আঘাত পাবে কেন?

বাঃ, তুমি বুঝতে পারছ না? তোমাদের ভারতবর্ষে বুঝি এসব চলে?

আমাদের ভারতবর্ষে কি না চলে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায় বাঘ ঘুরে বেড়ায়, মানুষ সবসময় সাপ নিয়ে খেলা করে–সেখানে প্রত্যেকদিন লাখ খানেক লোক পটাপট মরে যাচ্ছে অনাহারে–সেখানে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে এখনও চিতায় পুড়ে মরে–সেখানে কি না হয়– ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও।

দুঃখিত টপন, আমি তোমাকে হার্ট করতে চাইনি–সত্যি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান এতই কম।

কী সম্বন্ধে যে তোমার জ্ঞান বেশি, তা এখনও আমি টের পাইনি, বারবারা। যাকগে, জ্ঞান নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমি ভেবেছিলাম, তুমি একা আছ, আমিও একা আছি–সুতরাং আমরা দেখা করে কিছুটা সময় আনন্দে কাটাতে পারি। এর মধ্যে অ্যালিসের মনে করা-করি, কিংবা তোমার দ্বিধার কোনো প্রশ্ন আসবে, তা ভাবিনি। কিছুক্ষণ আনন্দ করার জন্য এত চিন্তা করছ কেন?

বাঃ ব্রিটিশ মেয়েদের সম্পর্কে এই বুঝি তোমার ধারণা? তারা শুধু আনন্দ করতেই চায়?

আমি মেয়েদের ব্রিটিশ মেয়ে কিংবা আফ্রিকান মেয়ে–এই হিসেবে ভাবি না। আমি মেয়েদের মেয়ে হিসেবেই ভাবি।

অত্যন্ত দুঃখিত, টপন, আমার পক্ষে আজ যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছে এতে অ্যালিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

ও কে, ও কে–তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে যে আনন্দ পেলাম, তার জন্যেই ধন্যবাদ। চিয়ারিও। গুড নাইট, বারবারা।

টেলিফোনের রিসিভারটা রেখেই আবার সেটা তুলল তপন। এবার হোটেলের কাউন্টারের নাইট ক্লার্ককে ডেকে বলল, শোনো, আমার ঘরের নম্বর তিপ্পান্ন, আমার নাম রয়। টি. রয়, আমি আজ রাত্রে আর বিঘ্নিত হতে চাই না। আমি আর কোনো টেলিফোনের ডাক পেতে চাই, কোনো নারী বা পুরুষ অতিথির সঙ্গে দেখা করতে চাই না, বুঝলে? বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুসংবাদের মতন জরুরি গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাড়া, কিছুতেই আজ রাত্রে আমাকে আর ডাকা চলবে না। এবং দুঃখের বিষয়, আমার বাবা কিংবা মা বেঁচে নেই, সুতরাং ওরকম কোনো খবর আসার সম্ভাবনাও নেই। বুঝলে? সুতরাং, কোনোক্রমেই

আমি আজ রাত্রে আর কোনো ডাক পেতে চাই না। আমি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি তো? আচ্ছা, ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি! ঝনাৎ!

সে-রাত্রে আর স্লিপিং পিল খেতে হল না, হুইস্কির বোতল খুলতে হল না, জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ার একটু বাদেই তপন এমনিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। কোথাকার কী এক অনির্দিষ্ট রাগে সে সারাক্ষণ জ্বলছিল। রাগ মানুষকে বড়ো ক্লান্ত করে দেয়। সেই ক্লান্তিতে তপন এখন ঘুমোচ্ছে!

৫-৬. তপন সেজেগুজে হোটেলে

সকাল সাড়ে আটটার সময় তপন সেজেগুজে হোটেলের কাঠের দরজা ঠেলে বেরোতে যাবে, দেখল রাস্তার উলটো দিকে অ্যালিস দাঁড়িয়ে আছে। সে তক্ষুনি রাস্তা পার হবার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছে কিংবা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, প্যারাসোলের নীচে অ্যালিসের স্তব্ধ মূর্তি। অ্যালিসের সুন্দর মুখখানা এখন একটু ফোলাফোলা, ঠোঁট দুটো শুকনো। বোধ হয় সর্দি লেগেছে, তাই ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

অ্যালিসকে দেখার প্রথম মুহূর্তেই তপন ভাবল, সে যেন ওকে দেখতে পায়নি, এই ভঙ্গি করে দ্রুত হেঁটে যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তপন নিজের অজান্তেই আবার তাকাল অ্যালিসের দিকে, এবার স্পষ্ট চোখাচোখি-এখন আর কিছুতেই চলে যাওয়া হয় না। তপন থমকে দাঁড়াল। কে আগে রাস্তা পার হবে? তপন না অ্যালিস? ট্রাফিকের সবুজ আলো জ্বলতেই হুড় হুড় করে গাড়ির স্রোত বয়ে গেল রাস্তা দিয়ে, সট সট করে এক-একটা গাড়ি যাচ্ছে-তার মাঝখানে সামান্য সামান্য ফাঁকে তপন দেখল অ্যালিস একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। লাল আলো জ্বলতে-অ্যালিসই রাস্তা পেরিয়ে এল।

মাত্র একটা দিন অ্যালিসের সঙ্গে দেখা হয়নি। পরশু রাতে অ্যালিসের ফ্ল্যাট থেকে চলে আসার সময় তপন তো তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। তবু অ্যালিস যেন সব বুঝতে পেরেছে। কাল বিকেলে তপন দেখা করতে যায়নি তার সঙ্গে, রাত্রে টেলিফোন করেনি-অ্যালিস নিজেই বোধ হয় দু-তিন বার টেলিফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, বারবারাও হয়তো তাকে টেলিফোন করে সব বলেছে। অ্যালিস হাসল না, কোনো অভিযোগ জানাল না, শুকনো গলায় বলল, টপন তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

তপন খানিকটা হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, কী ব্যাপার অ্যালিস, অফিস যাবে? এই সকাল বেলাতেই এসেছ?

যাব। তার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

আমার সঙ্গে? সকাল বেলাতেই বলতে হবে? আচ্ছা এসো-তপন আবার হোটেলের দরজা ঠেলে ঢুকল। অ্যালিস লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল-সে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল, তপন নিজের ঘরে ফিরে যাবে-কিন্তু তপন ডেকে বলল, এসো এখানেই বসা যাক!

লাউঞ্জে কয়েকটা সোফা সাজানো রয়েছে, সবগুলোই এখন ফাঁকা। অনেক কথা আছে যা এ রকম প্রকাশ্যে, সার্বজনীন আসনে বসে ঠিক বলা যায় না। কিছুটা নিরালায় একটু নরমভাবে বলা উচিত। কিন্তু তপন ওসবের ধার ধারে না। অ্যালিসকে সেখানেই বসতে ইঙ্গিত করে তপন নিজে ধপ করে বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। ঠুকে ঠুকে একটা সিগারেট উঁচু করে অ্যালিসের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইউ কেয়ার ফর আ স্মোক?

নতমুখী অ্যালিস কোনো উত্তর দিল না। তপন নিজেই ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, যেন অফিসের অধঃস্তন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছে, এই সুরে আরম্ভ করল, শোনো, অ্যালিস-

অ্যালিস একটা হালকা গোলাপি রঙের স্কার্ট পরে আছে, কোথাও কোথাও সেটা কোঁচকানো। আজ সে লিপস্টিক মাখেনি-দেখলেই বোঝা যায়, আজ সে শুধু চুলে দ্রুত চিরুনি চালিয়ে আর মুখে হালকা পাউডার বুলিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁট দুটো চেপে বিবর্ণ মুখে বসে আছে অ্যালিস।

তপন বলল, শোনো অ্যালিস, তুমি যা বলতে চাও আমাকে, সেটা আমি শুনব, নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু তার আগে, আমি একটা কথা বলতে চাই। তোমার সাহচর্যে একদিন আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। অত্যন্ত সুন্দর কেটেছে আমার সময়। সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু

অ্যালিস মুখ নীচু করে বসেছিল, এবার মুখ তুলে স্পষ্টভাবে তাকাল। তপন তবুও দ্বিধা না করে বলে চলল, কিন্তু, এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো। তা ছাড়া আর ক-দিন বাদে আমি তো চলেই যাব–সুতরাং, আমাদের সম্পর্কের এখানেই শেষ, আমি আজই হয়তো লণ্ডনের বাইরে যাব।

অ্যালিস যেন জানতই, তপন একথা বলবে। সে একটুও চমকাল না, মুখের একটা রেখাও কাঁপল না, সোজা তপনের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শুধু আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, কেন?

সেসব কথা না তোলাই ভালো। মেয়েরা তো এসব কথা জিজ্ঞেসও করে না।

তবু আমি করছি। কেন? এত শিগগিরই কেন?

আমি তা বলতে চাই না।

আই ইনসিস্ট–।

তুমি নিশ্চয়ই আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাও-না যে, তোমাকে আর আমার ভালো লাগছে না? সেকথা আমি বলতে চাই কিনা–সে-সম্পর্কেও আই অ্যাম নট সিওর! তা ছাড়া, মেয়েদের একটা ডিগনিটি থাকে–আমি তাতে আঘাত করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলাই তো যথেষ্ট যে, যতদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছি–আমরা খুব উপভোগ করেছি, আমরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। এখন আমি এই সম্পর্ক শেষ করতে চাইছি। আমরা দুজনে দু-জনের কাছ থেকে ভালো মনে বিদায় নিতে চাই, যাতে আর কোনো তিক্ততা না থাকে।

অ্যালিস তপনের চোখ থেকে নিজের চোখ সরাতে ভুলে গেল। একদৃষ্টে মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে আছে, স্পষ্টত তার মুখখানা আরও ফ্যাকাশে হয়ে আছে। নিজের ঠোঁটটা কাঁপছে একটু একটু। আচ্ছন্ন গলায় বলল, তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের আর দেখা হবে না?

হ্যাঁ। আমাদের আর দেখা হবে না!

কিন্তু টপন, তোমার সঙ্গে যে আমার একটা বিশেষ কথা ছিল।

আর কোনো কথাবার্তার কি দরকার আছে এরপর?

আমাকে যে বলতেই হবে।

ঠিক আছে, এখনই বলে ফেলো না!

এখানে বলা যাবে না।

তাহলে তো

টপন, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসতে পারি না?

তপন চরম অভদ্রতা দেখাতে জানে। সাহেবদের দেশে এসে এই ভদ্রবেশি অভদ্রতাগুলোকে খুব ভালো শিখে নিয়েছে, তেরছা চোখে ঘড়ি দেখে নিয়ে তপন নীরস গলায় বলল-বাট, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমার হাতে এখন বেশি সময় নেই। ন-টার সময় আমার এক জায়গায় দেখা করার কথা আছে।

টপন, তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না?

না। গিয়ে সেখানে কোনো লাভ নেই। আমাকে অনবরত ঘুরতে হবে। ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে যাব, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ড এঙ্গেলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, বি ই এ অফিসে গিয়েও একবার চেক করতে হবে-যদি একটা সিট দেয়-আমি কালই সম্ভব হলে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

কাল?

হ্যাঁ। তোমাদের এই জঘন্য শহর আমার আর একটুও ভালো লাগছে না।

কিন্তু টপন, তোমাকে যে একটা কথা বলতে চাই, সেটা না বললে আমার চলবেই না।

ঠিক আছে। বললুম তো, এখানেই বলে ফেলো চটপট।

এখানে?

অ্যালিস অসহায়ভাবে চারপাশে তাকাল। মাঝে মাঝে লিফট নেমে আসছে নিঃশব্দে, সুবেশ নারী-পুরুষ বেরিয়ে এল, কাউন্টারে চাবি রেখে কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে টক টক বা গট গট করে জুতোর শব্দ তুলে। কেউ কেউ বাইরে থেকে আসছে, লিফটে ঢুকে বোতাম টিপছে, কোনো কথা নেই, মাঝে মাঝে শুধু নীরস দু-একটা গুড মর্নিং-সবাই আড়চোখে দেখে যাচ্ছে ওদের দুজনকে। কাউন্টারে সকালের শিফটের ম্যানেজার মাথা ঝুঁকিয়ে লম্বা কাগজ পেনসিল দিয়ে যোগ-বিয়োগ করে যাচ্ছে-ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই যেন। এই ব্যবসায়িক হাওয়ায় এই রূপহীন পরিবেশে তাকে বলতে হবে? প্রতীক্ষিত তপন নির্লিপ্ত গলায় বলল, ইয়েস।

একটা ছোটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অ্যালিসও যথাসম্ভব নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করে বলল, কীভাবে কথাটা আমি বলব জানি না। কিন্তু তুমি যদি কালই চলে যাও, কিংবা তোমার যদি আর না সময় থাকে তাহলে আমাকে এখানেই বলতে হবে। আমি প্রত্যেকবার নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনি, এবারও বোধ হয় বিপদে পড়তে যাচ্ছি-নিজেকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতাই নেই আমার-তবু বলতে আমাকে হবেই-টপন আমি মনে মনে গভীরভাবে বুঝতে পারছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই-আমার ভালোবাসা এইরকম-ডাজ দ্যাট মিন এনিথিং টু ইউ?

তপন যেন অন্য অনেক কিছু আশা করেছিল। সামান্য এই কথাটা শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, আমাকে ভালোবেসেছ? হাঃ

প্লিজ টপন, তুমি আমাকে এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোরো না। আজ অন্তত আমি কোনো ব্যঙ্গবিদ্রূপ সইতে পারব না। বিশ্বাস করো–

ছেলেমানুষী কোরো না অ্যালিস! আমাদের তো এ-রকম কোনো কথা ছিল না। আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছিলাম–

আমি নিজেও তো জানতাম না। এটা যেন একটা মিরাকল। কতদিন ধরে আমার মনটা শুকনো হয়েছিল-হঠাৎ

শোনো অ্যালিস, সাতদিন-দশদিনের ভালোবাসা, এ-রকম অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি কাঁচা ছেলে নই। তোমারও একবার ডিভোর্স হয়ে গেছে, তুমিও কাঁচা মেয়ে নও–সুতরাং এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোবো মানে হয় না।

টপন তুমি আমাকে আর একটু সময় দেবে? আমি প্রথম বিয়ে করেছিলাম যখন, তখন আমার উনিশ বছর বয়েস। আমি এই পৃথিবীতে একা, কখনো কারুর কাছ থেকে একটুও স্নেহ, ভালোবাসা পাইনি–তাই এডমাণ্ডের সঙ্গে যখন পরিচয় হল, ওর মমতা মাখানো কথা শুনে আমি মুগ্ধ আর অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল–আমার জীবনেরও মূল্য আছে–আমার জন্য কেউ খুশি হয়, আমার কথাও কেউ ভাবে–আমি এডমাণ্ডের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম–কত স্বপ্ন দেখেছি ওকে নিয়ে–কিন্তু এডমাণ্ড আমার সব স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন করে দিয়েছে–ও আমার ভালোবাসার একটুও মূল্য দেয়নি আমাকে কী কষ্ট দিয়েছে তুমি জান না–এডমাণ্ড ছিল জুয়াড়ি, ও সব কিছু নিয়ে জুয়া খেলতে চায়–মানুষের ভালোবাসা, শরীর, স্বপ্ন–এ সবই ও জুয়ার এক একটা দান মনে করে–আর কিছুদিন একসঙ্গে থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম–আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হত রোজ–এডমাণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর অনেকদিন আমি পুরুষ দেখলেই ভয় পেতাম–মনে হত পুরুষ মাত্র জুয়াড়ি–বিবাহবিচ্ছেদের পর অন্তত পাঁচ-ছয় বছর আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়েছি–তারপর আস্তে আস্তে সেই দুঃস্বপ্ন কেটে যায়, তবুও, কোনো পুরুষকেই আমি আমার প্রাণের মানুষ বলে ভাবতে পারিনি–দু-এক

জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে–তাদের কারুর কারুর সঙ্গে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছি–কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার সবকিছু আবার ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে–আমি ভেবেছিলাম আমি আর জীবনে কখনো ভালোবাসতে পারব না–কিন্তু হঠাৎ, আমি নিজেই বুঝতে পারিনি, তোমাকে দেখার পর–আমি আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি–তোমার রুক্ষ ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা- এসব কিছুই আমার গায়ে লাগে না–আমার মনে হয় তোমার মধ্যে একটা অভিমানী শিশু লুকিয়ে আছে, তুমি শিশুর মতোই আঘাত করতে চাও–কিন্তু সে-আঘাতে ব্যথা লাগে না–টপন, পরশু রাত থেকে আমি অনবরত তোমার কথা ভাবছি–এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না তোমাকে–এ যদি ভালোবাসা না হয়–

অ্যালিস কথা বলছিল প্রায় ফিসফিস করে, তবু বোঝা যায় তার বুকের অনেক ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কথাগুলো। কোলের ওপর রাখা হাত দু-খানি বড়ো বেশি সাদা আর করুণ, আঙুলের ডগাগুলো একটু একটু কাঁপছে–ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলে উঠছে তার বুক দু টি। কথা বলার সময় সে একবারও তপনের মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি। তপন একটার-পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছে। অ্যালিসের আবেগ যেন তাকে একটুও স্পর্শ করল না, নিছক হালকাভাবে বলল, প্রায় ন-টা বাজে, এবার তাহলে উঠতে হয়। তুমিও যদি অফিস যেতে চাও–

সেই নির্মম অসৌজন্যে অ্যালিসের মুখখানা যেন কুঁকড়ে গেল। এর চেয়ে, কেউ একখানা চাবুক দিয়ে শপাং করে তার মুখে মারলে সে কম আহত হত। তবুও সে ভিখারিনির মতন বলল, টপন তুমি বলেছিলে আমেরিকা থেকে তোমাকে দু-বছরের জন্য বাইরে অন্য কোনো দেশে থাকতে হবে–কানাডার বদলে তুমি ইংল্যাণ্ডে থাকতে পার না? তুমি তো ইচ্ছে করলে চাকরি পেতে পার।

কিন্তু আমি লণ্ডনে চাকরি নিতে যাব কেন?

তুমি এখানে চেষ্টা করলেই চাকরি পেতে পার না? তোমার যা ডিগ্রি আছে–

সেকথা পরে, কিন্তু এই গড ড্যাম লণ্ডনে আমি চাকরি নিতে যাব কেন?

কানাডার চেয়েও কি লণ্ডন ভালো জায়গা নয়? তুমি যদি এখানে থাক–আমি তোমাকে কাছে পেতে পারি। টপন আমি তোমাকে

তপন হঠাৎ খুব রেগে গেল। অ্যালিসের কথার মাঝখানেই কথা থামিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললে, অলরাইট, তুমি আমাকে ভালোবাস–এই কথাই আবার বলবে তো? সো হোয়াট? তোমাদের ওসব ভালোবাসার ন্যাকামি আমার ঢের ঢের জানা আছে! তুমি আমাকে ভালোবাস আর যাই করো, আমি তো তোমাকে একটুও ভালোবাসি না। দেন! আমাকে মাস এক হাজার পাউণ্ড মাইনে দিলেও আমি লণ্ডনে কিছুতেই থাকতে পারব না তোমাকে খুশি করার জন্য। আমি তোমাকে কখনো কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি–সুতরাং তুমি কোনো অভিযোগ করতে পারবে না আমার নামে। তোমাকে আমার এই ক-দিন বেশ ভালো লেগেছিল–এখন আর ভালো লাগে না–ব্যস! এর মধ্যে ভালোবাসা-টালোবাসার কোনো ব্যাপার নেই! এখন আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো, তাইনা?

অ্যালিস বিহ্বলভাবে তাকিয়ে আছে, যেন তপনের সব কথা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই সে তার সমবোধ ফিরে পেল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, হ্যাঁ, ভালোবাসা যদি না থাকে, তাহলে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। সেটাই তো স্বাভাবিক। তুমি ঠিকই বলেছ টপন। তাহলে, আর আমাদের দেখা হবে না। না?

না।

তপনও উঠে দাঁড়িয়েছে। শেষ বিদায়টুকু যথাসম্ভব গ্লানিহীন করার চেষ্টায় সে অ্যালিসের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। অভিভূতের মতন অ্যালিস তার হাতে হাত রাখল। তপন তার গালে ঠোনা মারার মতন একটা চুমু দিয়ে আজ সকালে এই প্রথম বার ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। হাসি মুখেই বলল, গুড বাই অ্যালিস।

গুড বাই টপন।

ওরা একসঙ্গেই বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। অনেকদিন বাদে আজ লণ্ডনের আকাশে রোদ দেখা দিয়েছে। এই সামান্য রোদ পেয়েই রাস্তার অধিকাংশ মেয়ে-পুরুষের মুখ খুশি।

খুশি। শুধু অ্যালিসেরই মুখ নীচু, যেন তার খুব শীত করছে-শরীরটা সেইরকম আড়ষ্ট। রোদের জন্যই বোধ হয় তপনও বেশ খুশি হয়ে উঠল-বেশ বড়ো বড়ো পা ফেলে সে হেঁটে চলল অক্সফোর্ড সার্কাসের দিকে। অ্যালিসও হাঁটছে তার পাশে পাশে কেউ আর কোনো কথা বলছে না। তপন জানে অ্যালিসের লাইব্রেরি সেই ওয়েস্ট এণ্ডে-এ রাস্তায় নয়। তবু অ্যালিস তার সঙ্গে এদিকে আসছে কেন? তপন চুপচাপ অনেকখানি হেঁটে গেল, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল অ্যালিসকে। অ্যালিস আর তার দিকে চাইছে না- তবু হাঁটছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তপন একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, অ্যালিস, তুমি আজ লাইব্রেরিতে যাবে না?

অ্যালিসও দাঁড়াল, খানিকটা চিন্তা করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাব–

তাহলে এদিকে যাচ্ছ কেন?

এদিকে? ও, তাইতো, ভুল দিকে এসেছি–

ঠিক আছে, আমি চলি-

তারপর, তপন যেন দয়া করছে-সম্রাট যেন তাঁর চাকরানিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন-এই ভঙ্গিতে অ্যালিসের দিকে চেয়ে আবার হাসল, নিজেই হাত বাড়িয়ে অ্যালিসের নরম, দুর্বল ইচ্ছাশক্তিহীন হাত তুলে নিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বলল-গুড বাই অ্যালিস।

একটা নীল রঙের ডবল ডেকার এসে থামতেই তপন তাতে উঠে পড়ল আর পিছনে তাকাল না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একটা খালি আসন পেয়ে বসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ

ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। অ্যালিস সেখানেই মূর্তির মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যালিস বাসের জানলার দিকে চেয়ে নেই।

.

০৬.

তপনের কলেজ-জীবনের বন্ধু দিবাকর এখানে বেশ ভালো চাকরি পেয়েছে। স্ত্রী এবং দু বছরের বাচ্চাকেও আনিয়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে। দিবাকরের সঙ্গে অনেকদিন একসঙ্গে পড়েছে তপন, একসঙ্গে রিসার্চও করেছে। দিবাকর বেশ বড়োলোকের ছেলে, অনেক সন্ধ্যে বেলা দিবাকর তপনকে জোর করে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। দিবাকরের বোন অরুণার সঙ্গে তপনের ভালো করে ভাব জমে ওঠার আগেই বিয়ে গেল একজন কংগ্রেসি এম পির ছেলের সঙ্গে। দিবাকরের বউদিও তপনকে খুব স্নেহ করতেন। তপন আর দিবাকরকে একসঙ্গে দেখলেই তিনি ঠাট্টা করে বলতেন আজ এক আকাশে দুই সূর্য উঠেছে দেখছি! এম এসসি-তে দিবাকর ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়ায় তপন খুব স্বস্তি বোধ করছিল। সে ফার্স্ট হলে যদি দিবাকরের হিংসে হত কিংবা দিবাকরের বাড়ির লোকজন দুঃখ পেয়ে তপনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দিত তাহলে সেটা খুব পরিতাপের ব্যাপার হত।

দিবাকর ছেলেবেলা থেকেই বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। বড়োলোকের ছেলে, চিরকাল দু-তিনটি প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়েছে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে, বিলেত যাবে, বিলেত থেকে ফিরে এসে কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর হবে-এই তার বাঁধাধরা পথ, সেই পথেই ঠিক এগোচ্ছে-তপনের মতন তার জীবন ছন্নছাড়া নয়।

দিবাকরের স্ত্রী ললিতা এখনও ইংরেজিটা তেমন রপ্ত করতে পারেনি বলে বাইরে বিশেষ বেরোয় না। তার বদলে, স্বামীকে যতদূর সম্ভব বাঙালি রান্না খাইয়ে তৃপ্তি দেয়। স্বামীকে মদ ছুঁতে দেয় না, মেমসাহেবদের সঙ্গে মিশতে দেয় না, স্বামীর মাইনের টাকা নিজের কাছে রেখে স্বামীকে শুধু হাত-খরচ দেয়। এসব দেখলেই বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়,

দিবাকর তার বউকে বেশ ভয় করে। অনেকদিন বাদে কোনো বাঙালি দম্পতির সংস্পর্শে এল তপন এবং অবাক হয়ে লক্ষ করল দিবাকর অনেক বদলে গেছে। খুব খোলামেলা স্বভাব, সবসময়ই খানিকটা অন্যমনস্ক ধরনের ছেলে ছিল দিবাকর, এখন সে বেশ দায়িত্ববান, সংসারী মানুষ। দিবাকরকে দেখে তার পরিবর্তনের কথাটা প্রথমেই বলবে ভেবেছিল তপন, কিন্তু বলল না এইজন্য যে, তাহলে দিবাকরও নিশ্চয়ই তপনকে বলত, তুইও অনেক বদলে গেছিস! তপনকে কিছু বলতে হল না-দিবাকরই সেকথা বলল খানিক বাদেই।

দিবাকর নিয়মিত চিঠি লেখে তপনকে। তপনের লণ্ডনের আসার খবর পেয়ে সে প্রথম দিনই এয়ারপোর্টে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে তপনের খটকা লেগেছিল- দিবাকর কিংবা ললিতা তপনকে একবারও বলেনি-তাদের সঙ্গে গিয়ে থাকতে।-ওরা তপনকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল-তবু তপন প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল-ওরা তাকে হোটেল ছেড়ে ওদের সঙ্গে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। একথা ঠিক, তপন কিছুতেই থাকত না-একা থেকে তার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, কিছুতেই আর সে কারুর সাথে বেশি মাখামাখি পছন্দ করে না। বিশেষত ওদের বাড়িতে বাচ্চা ছেলে আছে-বাচ্চাদের তপন একেবারেই ম্যানেজ করতে পারে না-একটু বাদেই তার রাগ হয়। কিন্তু দিবাকররা যে তাকে একবারও অনুরোধ করল না- এতে তপন বেশ অবাক হয়েছিল।

দিবাকরদের বাড়িতে এসে তপন কারণটা বুঝতে পারল। কলকাতায় দিবাকরদের প্রকান্ড বাড়ি টালিগঞ্জে, বনেদি আমলের ঘরগুলো বিরাট বিরাট-তাও অনেক ঘর খালি পড়ে থাকে বাড়ির সামনে বাগান। লণ্ডনে দিবাকরের যেরকম ঘরে আছে, কলকাতায় ওদের বাজার সরকারও তার চেয়ে ভালো জায়গায় থাকে। এখানে তপনকে এনে ওরা জায়গা দিত কোথায়? ছোট্ট একটা ঘর-সেটাই শোবার ঘর, বসবার ঘর, সব কিছু জিনিসপত্রে ঠাসা পা ফেলার জায়গা নেই পর্যন্ত-পাশে একচিলতে একটা রান্নার জায়গা। মশলা দিয়ে মাছের ঝোল রান্না করার সময় বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোয় বলে পাশের ভাড়াটেরা অভিযোগ

করেছে।–ললিতা তাই ভয়ে ভয়ে থাকে। বিদেশে এসে তে কষ্ট করে থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না দিবাকরের–কলকাতায় তাদের অত সম্পত্তি, এম এসসি-তে ভালো রেজাল্ট করেছে– কলকাতাতেই সে সুখে থাকতে পারত–কিন্তু গায়ে একটা বিলেত-ফেরত পালিশ না লাগালে বুঝি চলছিল না। বিলেতের মোহে ললিতাও সব কষ্ট বেশ সহ্য করছে। দেশে তো কেউ তাদের এ অবস্থার কথা জানতে পারবে না। তারা মাঝে মাঝে পিকচার পোস্টকার্ড পাবে –তাতে কত সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের ছবি। এইসব ব্যাপার দেখলে তপনের আজকাল খুব হাসি পায়।

ললিতা তপনকে পুরোপুরি বাঙালি রান্না খাওয়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে–দেশ থেকে পাঠানো মুসুরির ডাল যে এতদিন কৃপণের মতন জমিয়ে রেখেছিল–আজ তপনের সম্মানেই সেটা বেঁধে ফেলল। অনেকগুলো ডিম ফেটিয়ে তার মধ্যে চিংড়ি মাছ ডুবিয়ে ডুবিয়ে বড়া ভাজছে এখন, ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হচ্ছে। আগুনের আভায় ললিতার ফর্সা মুখখানা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এখন, তপন আর দিবাকর রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে গল্প করছে তার সঙ্গে।

আমেরিকান কায়দা অনুযায়ী তপন পকেটে করে হুইস্কির পাঁইট নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দিবাকরকে দেখেই বুঝেছে, এ বাড়িতে এসব চলে না। তবুও ওদের রাগাবার জন্যই তপন বোতলের মুখ খুলে কাঁচা হুইস্কিই খানিকটা ঢেলে নিল গলায়, তারপর বোতলটা দিবাকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খা!

ললিতা আড়চোখে তাকিয়ে আছে, দিবাকর বলে উঠল, না, না, আমি ওসব খাই না। কখনো।

কখনো খাস না, আজ খেয়ে দেখ। আমি তোকে দীক্ষা দিচ্ছি!

না, না, পাগলামি করিস না!

তপন ললিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ললিতা, আজ আমি তোমার বরের জাত মেরে দেব। আমি ওর ঠোঁটে জোর করে হুইস্কি ছোঁয়াবই!

ললিতা ঠিক প্রাণখুলে হাসতে পারছে না, তবু হাসবার চেষ্টা করে বলল, ওসব অখাদ্য কুখাদ্য খান কেন? কী লাভ হয়?

তুমিও একটু খেয়ে দেখো না! খেলেই বুঝতে পারবে।

ইস। গন্ধতেই আমার বমি আসে। দাঁড়ান না, আপনার বিয়ে হোক আগে, তখন আপনার বউই আপনাকে ওসব খাওয়া ছাড়াবে।

আমার ব্যাপারে আপত্তি করবে তেমন মেয়ে আমি বিয়েই করব না।

তবে বুঝি আপনি ওইসব বেড়ালমুখো মেমসাহেবদের একটাকে বিয়ে করবেন। মি. চ্যাটার্জি একটাকে বিয়ে করেছেন, কী দুরবস্থা তাঁর-দেখছি তো নিজের চোখে।

মাথা খারাপ। আমি যদি বিয়ে করি, তাহলে মেম-ফেম না। তোমার মতন কোনো সুন্দরী বাঙালিনিকেই বিয়ে করব নির্ঘাৎ।

দিবাকর বলল, তপনটা কীরকম চালাক দেখছ। এই ফাঁকে তোমাকে সুন্দরী বলে নিল। ললিতা ভ্রূভঙ্গি করে স্বামীকে বলল, কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি তাতে?

তুমি কথাটা আমার মুখ থেকেও আবার শুনতে চাও?

তপনবাবু, কোনো বাঙালি মেয়ে কিন্তু আপনার ওসব সহ্য করবে না।

আমার কীসব?

এই যে ঢোক ঢোক করে মদ খাওয়া–কী বিশ্রী যে দেখায় মানুষকে সেসময়।

সে কী! এই-যে আমি শুনেছিলাম বাঙালি মেয়েরা আজকাল অনেক স্মার্ট হয়েছে, তারাও সিগারেট খায়, মদ খায়, বিয়ের আগেই ছেলেদের সঙ্গে ইয়ে-টিয়ে-

মোটেই না! বাঙালি মেয়েরা এখনও অধঃপাতে যায়নি। আপনার এইসব সিগারেট-খাওয়া মদ-খাওয়া মেমরা বাঙালি মেয়েদের পায়ের ধুলোরও যোগ্য নয়।

সর্বনাশ। সব বাঙালি মেয়েই এ-রকম সতী-সাবিত্রীর পরাকাষ্ঠা? তাহলে আমার ভাগ্যে একটাও জুটবে না দেখছি। আমার আর তাহলে বিয়ে করা হল না। যাকগে, দরকার কী। বেশ তো চলছে, নিউ লাভ ইন এভরি উইক এণ্ড।

দিবাকর একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সে জানে, তার স্ত্রী, এই ধরনের লুজ কথাবার্তা মোটেই পছন্দ করে না। তপনটা চিরকালই চ্যাংড়া ধরনের। আরও কী বেফাঁস বলে ফেলবে, তাই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সে বলল, চল তপন, কাল আমরা সবাই মিলে মাদাম টুসোর মিউজিয়াম দেখে আসি।

তপন অবাক হয়ে বলল, মাদাম টুসো? এক্ষুনি কী। আরও দু-তিন বছর তো থাকবি তোর ছেলেটা আর একটু বড়ো হোক, তখন ওই মোমের পুতুলগুলো তোর ছেলেকে দেখিয়ে আনিস-তার ভালো লাগবে। আমরা কী দেখব?

ললিতা বলল, আমাদের একবার দেখা হয়ে গেছে। আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে, জানেন এবার ওখানে নেহেরুজিরও মূর্তি বসানো হয়েছে।

তপন কোনো উত্তর দিল না। আকস্মিকভাবে সে একটু দুঃখিত বোধ করল। সে বুঝতে পারল, দিবাকর আর ললিতার সঙ্গে তার আর ঘনিষ্ঠতা থাকবে না। ওদের সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই, এমন কোনো বিষয় নেই-যা নিয়ে ওদের সঙ্গে সে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে। তার স্বভাবটাই এখন এমন হয়ে গেছে যে মোমের পুতুল নিয়ে বেশি কথা তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। ওরা নিশ্চয়ই স্টেট গ্যালারি দেখেনি। ভাগ্যিস ওদের ছোটো ছেলেটা ঘুমোচ্ছে-নইলে হয়তো তার আধো আধো গলায় আবৃত্তিও শুনতে হত।

দিবাকর বলল, তাহলে চল আমরা উইণ্ডসর ক্যাসল কিংবা টাওয়ার অব লণ্ডনে যাই।

তপন আলগাভাবে উত্তর দিল, রে, আমার ভিড়ের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে ওসব দেখতে একেবারেই ভালো লাগে না।

অন্তত সবাই মিলে কোনো একদিন বেড়াতে যাই কোথাও।

তার চেয়ে ঘরে বসে আড্ডা মারাই তো ভালো।

ললিতা রান্না করুক, আমরা পাশের ঘরে বসি আয়। আমরা এখানে থাকলে ওর রান্না শেষ হবে না।

তপন মদের বোতল ও গ্লাস নিয়ে উঠে এল। দিবাকরদের শোওয়ার ঘরে দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝুলছে। আলমারিতে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও উপনিষদ এর বাঁধানো সেট। কলকাতায় থাকতে তপন কোনোদিনও দিবাকরের গীতাঞ্জলি কিংবা উপনিষদ সম্পর্কে আগ্রহের কথা টের পায়নি। দিবাকর তপনের মদের বোতলটার দিকে বেশ ঘৃণার চোখে তাকিয়ে যথেষ্ট দূরে গিয়ে বসল, তারপর বলল, তোর ব্যাপার কী বলতো? তুই দারুণ বদলে গেছিস!

হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে ফেলল তপন। সে জানত, দিবাকর ওকথা বলবেই! সবাই বদলায়। একমাত্র আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কোনো বদল টের পাওয়া যায় না।

কী বদল দেখলি আমার? তুই তো ঠিক আগের মতোই আছিস।

তুই একবারে বেপরোয়া হয়ে গেছিস তপন। তোর চেহারার মধ্যেও একটা রুক্ষ ভাব এসেছে। চোখের নীচে কালি।

বড্ড খাটতে হয় রে।

যা যা, খাটুনি দেখাস না। তবু তো আমেরিকায় সপ্তাহে দু-দিন ছুটি। আমার এখানে সপ্তাহে সাড়ে ছ-দিন হাড়ভাঙা খাটুনি–তুই এত মদ খাস কেন?

এত তো খাই না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু।

দেশে থাকতে তো তোকে কোনোদিন এক ফোঁটাও খেতে দেখিনি।

দেশে থাকতে তো অনেক কিছুই করিনি। অনেকদিন দু-বেলা পেট ভরে খেতেই পাইনি। ওসব কথা বাদ দে। কলকাতার খবর বল, ড. সিংহ এখনও হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট আছেন?

না, রিটায়ার করেছেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, সুবীর ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তুই শুনেছিস? তুই যাকে পড়াতিস, সুবীর–তোকে চিঠি লেখেনি?

আমায় কেউ চিঠি লেখে না। লিখলেও আমি উত্তর দিই না।

কেন?

কেন আবার কী! আমার স্বভাবের দোষ।

দময়ন্তীও তোকে চিঠি লেখে না?

দময়ন্তী?

তপন ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। এমন নয় যে সে দময়ন্তীর নাম শুনে চিনতে পারেনি। কিন্তু দময়ন্তী তাকে পাঁচ বছর ধরে চিঠি লিখে যাবে–এটা দিবাকর ভাবল কী করে। সুবীর গুপ্ত বলে একটা ছেলেকে কিছুদিন পড়িয়েছিল তপন, তার দিদি দময়ন্তী। প্রায়ই এসে তার সঙ্গে গল্প করত, দু-একদিন রাস্তাঘাটেও দেখা হয়েছে–অনেক অনেক ভিড় সরিয়ে দময়ন্তী তার কাছে এসে বলেছে, কোথায় যাচ্ছেন? সবসময় আপনার ভুরু কুঁচকে থাকে কেন? কী এমন চিন্তা করেন সবসময়?

শিল্প প্রদর্শনীর দু-একটি দুর্লভ সংগ্রহ থাকে-যেখানে লেখা থাকে হাত দেওয়া নিষেধ, দময়ন্তী সেই ধরনের মেয়ে। দূর থেকে দেখতেই ভালো লাগে-কাছাকাছি গেলেই কিছু একটা ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে। তপন তবু-খানিকটা কাছাকাছি গিয়েছিল-কিছুই ভেঙে যায়নি, কোনো অভ্রান্ত জ্যোতিষীর গণনায় নির্দিষ্ট দিনটাতেই নিজেকে ভাঙবে-দময়ন্তী যেন সে-রকম ঠিক করে রেখেছিল।

তপন বলল, দময়ন্তী আমাকে চিঠি লিখবে কেন?

সবাই তো বলে তুই দময়ন্তীর ওপর অভিমান করেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিস।

পাগল নাকি। আমি কারুর ওপর অভিমান করেই দেশ ছাড়িনি। তুই কেন এসেছিস?

আমার কথা আলাদা। আমি তোর মতন বাউণ্ডুলে হয়ে যাইনি। দময়ন্তীর খবর জানবার জন্য তোর আগ্রহ হয় না?

না।

খবর জানিস, দময়ন্তীর বিয়ে হয়েছে কি না?

আমার কোনো আগ্রহ নেই।

তুই নাকি আর দেশে ফিরবি না ঠিক করেছিস? কানাডা বা আমেরিকায় সেটল করবি?

হুঁ।

কোনো মানে হয়? তুই এমন একটা ভালো বংশের ছেলে।

তপন স্বচ্ছ কৌতুকে এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, বংশ? অনেকদিন পর শুনলাম কথাটা। আমাদের কী এমন ভালো বংশ? তুই কী জানিস তার সম্বন্ধে?

তোরা তো বিক্রমপুরের রায়চৌধুরি।

তপনের হাসি পায়, থামে না। বিক্রমপুরের রায়চৌধুরী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-সবাই তো কোথাও-না- কোথাও জন্মেছে-কেউ এঁড়েদার ঘোষাল, কেউ বর্ধমানের পততুন্ডি, কেউ ফরিদপুরের সরখেল, তোরাও তো টালিগঞ্জের সরকার-কী এল গেল? বিক্রমপুরের রায়চৌধুরি বড়ো কীসে?

সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ট্র্যাডিশনকে অস্বীকার করে মানুষ বেশি দূর পৌঁছোতে পারে না।

মাইরি বলছি দিবাকর, আমি ঠাট্টা করছি না। তুই বংশের কথা তুললি তো–আমাদের বংশ মোটেই কোনো কারণে উল্লেখযোগ্য নয়। তুই বোধ হয় জানিস না, আমার মা একসময় ঝি-গিরি করতেন, আমার বুড়ো ঠাকুরদার কাজ ছিল ঠোঙা বিক্রি করা।

বাজে কথা বলিস না।

বিশ্বাস হল না? এই দেখ আমার বাঁ-হাতটা–চেটোতে একটা কালো দাগ দেখছিস? কীসে হয়েছে জানিস? ল্যাবরেটরিতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয়–আমার তখন সাত বছর বয়েস, আমরা তখন এক বাড়িতে আশ্রিত ছিলাম-খাওয়া-থাকার বদলে আমার মা সে বাড়িতে ঝি-গিরি করতেন, আমার ঠাকুরদার টিবি হয়েছিল, পাছে সে-কথা জানাজানি হলে আমাদের সবাইকে সে-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়-তাই ঠাকুরদার কোনো চিকিৎসা করারও চেষ্টা হয়নি। আমাকে যা খাবার দিত, তাতে আমার পেট ভরত না, সবসময় খিদের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান করতাম। একদিন লোভ সামলাতে না পেরে রান্নাঘর থেকে এক টুকরো ইলিশ মাছ চুরি করেছিলাম, কিন্তু সামলাতে পারিনি–ধরা পড়ে গেছি–বাড়ির গিন্নি আমাদের হাভাতের বংশ বলে গালাগাল করেছিলেন। তবু দয়া করেছিলেন তিনি, সেই অপরাধে আমাদের তাড়িয়ে দেননি–শুধু একটা শাস্তি দিয়েছিলেন, আমার মার সামনেই সে-বাড়ির গিন্নি–সাত বছরের ছেলের চুরির অপরাধে গরম হাতা দিয়ে আমার হাতে ছেকা দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলাম আর গিন্নিমার দয়া পাবার

জন্য বেশি বেশি করে ডুকরে কেঁদে বলেছিলাম, আর করব না, আর কোনোদিন করব না। কিন্তু ঠিক তার পরদিন, মাছ কোটার সময় কারচুপি করে আমার মা দু-খানা মাছভাজা চুরি করে এনে আমাকে খাইয়েছিলেন। সুতরাং, শুধু আমি চোর নয়, আমার মা-ও চোর ছিলেন।

মা-র নামে এসব কথা বলতে তোর মুখে আটকায় না?

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সত্যি কথা বলতে তো আমার মুখে আটকাবার কথা নয়।

তুই ভুলে যাসনি তপন, বিজ্ঞানের প্রয়োগ শুধু ব্যাবহারিক। শুধু ব্যাবহারিক প্রয়োগ নিয়েই মানুষের জীবনটা বিচার করা চলে না। মানুষ এখনও এতটা বস্তুতান্ত্রিক হয়নি। অত সত্যি কথা বলবার বড়াই করিস না– তোর যদি সত্যিকারের জ্ঞান হত–তাহলে তোর মায়ের দুঃখের আড়ালে যে সত্য ছিল–সেটাও তুই বুঝতে পারতিস। তুই যে ঘটনাটা বললি, সেটা সত্যিই খুব মর্মান্তিক–কিন্তু সেটা তোর দেশ ছাড়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না। একজন বা কয়েকজন মানুষ কী খারাপ ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে দেশের বিচার হয় না, দেশ তার চেয়ে অনেক বড়ো। খারাপ মানুষ কোন দেশে নেই।

দেখ দিবাকর, লেকচার ঝাড়িসনি। ওসব আমাকে কোনো অ্যাপিল করে না। ওসব সেন্টিমেন্টাল দেশপ্রেম-ফ্রেমের কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে। যে দেশে জন্মেছি সেটাই আমার দেশ–আর সেই দেশটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো–ওসব ন্যাকা কথার কোনো মানে হয় না। আমি তো জন্মেছিলুম ঢাকা শহরে–সেটা এখন বাংলাদেশ, অন্য দেশ। ভারতবর্ষও তো আমার কাছে অন্য দেশ–ঢাকা ছেড়ে যদি অন্য কোথাও থাকতেই হয়, তাহলে ভারতবর্ষ কেন, বার্মা, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া যেকোনো দেশকেই আমার দেশ করে নিতে পারি। আমি সেটাই চেষ্টা করছি–কিংবা কোনো দেশই নিজের দেশ হবে না–সারাজীবন নানান দেশে কাটাব।

তুই নিজেই জানিস–তোর কথায় অনেক যুক্তির ভুল আছে। যেখানে তোর মা-বাবা

আমার যুক্তি খুঁজে দরকার নেই। আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই, সব বন্ধন চুকে গেছে।

অত সহজে বন্ধন চোকানো যায় না। ভারতবর্ষ তোর ভালো লাগে না?

না।

তাহলে আমেরিকা-কানাডাই তোর ভালো লাগে?

মাথা খারাপ। ভালো লাগে কে বলেছে? জঘন্য লাগে। যত রাজ্যের চাষা, গোঁয়ার আর হিপক্রিটে ভরতি-ভালো লোক যে কটা, তারা খড়ের গাদায় আলপিনের মতন লুকিয়ে আছে-রাস্তাঘাট দিয়ে কখনো সহজভাবে হাঁটা যায় না।

তাহলে আছিস কেন? ওখানেই ফিরে যাবি কেন?

জানিস না? কেন যাব, জানিস না?

না।

তপন আবার মেজাজ খুশি করে একগাল হাসল। বিচিত্র সেই হাসির ভঙ্গি। বুড়ো আঙুলের ওপর তর্জনী রেখে টুসকি দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, এইজন্য।

দিবাকর বলল, টাকা?

হ্যাঁ, মাইরি। তুই যেটা জিজ্ঞেস করলি-তার উত্তরটাও সবাই জানে, তবু ন্যাকা সেজে থাকে। তবু জিজ্ঞেস করে। নিজেরা উত্তর দেবার সময় মিথ্যে কথা বলে! এই ইংল্যাণ্ডে কিংবা আমেরিকায় যে হাজার হাজার ভারতীয় ছেলে আছে, তুই তাদের জিজ্ঞাসা কর, কেন তারা এসব দেশে পড়ে আছে? চিনিতো আমি ওদের, সব শালা মিথ্যে কথা বলবে। বলবে, দেশে কাজ করার সুযোগ নেই, ল্যাবরেটরি নেই, গভর্নমেন্টের সাহায্য নেই, হ্যাঁন নেই, ত্যান নেই। কিন্তু আমি ওসব মিথ্যে কথা বলতে চাই না। টাকা জিনিসটা বড় মিষ্টি ঝনঝনে টনটনে কী সুন্দর আওয়াজ। পকেটে টাকা থাকলে শীতকালেও গরম লাগে,

গরমকালে গা ঠাণ্ডা হয়-সেই টাকা ভারতবর্ষের থেকে অন্তত পাঁচ গুণ বেশি পাওয়া যায় এসব দেশে। সেইটাই আসল কথা। টাকা থাকলে যেকোনো আরাম।

কিন্তু টাকায় কেনা আরামেরও তো একটা সীমা আছে। মনের সুখ যদি না থাকে।

সুখ? সকলের মনের সুখ একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথ পড়িসনি, সুখ চাই নাই, মহারাজ, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ-আমাকে মাসে ন-শো ডলার মাইনে দিচ্ছে, টাকায় হিসেব করলে সাড়ে ছ-হাজার টাকা। তোর ভারতবর্ষে কেউ দেবে? এইভাবে আমি আমার মায়ের ঝি-গিরির শোধ নিচ্ছি!

তপন, তোর কথাবার্তা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে। তুই যেন সবসময় বেশি উত্তেজিত, হাই স্ট্রং-তুই ঠিক সুস্থ আছিস তো?

আমি চমৎকার আছি রে, দিবাকর।

দিবাকর একটা বড়ো রকমের নিশ্বাস ফেলে বলল, কী জানি। ভালো থাকলেই ভালো। তবু তোর কথা আমি প্রায়ই ভাবি রে তপন। বিশ্বাস কর, আমার মনে হয়, তুই বড়ো অসুখী!

মাইরি বলছি, আমি একটুও অসুখী নই। ফাইন আছি!

তোর বাবা জ্যাঠামশাই কত বড়ো বিপ্লবী ছিলেন, আমি সব জানি, তাঁরা দুজনেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। আর তোর এই পরিণতি! তাঁরা কি এইজন্য প্রাণ দিয়েছিলেন? দেশের ছেলে বিদেশে গিয়ে থাকবে বলে?

আবেগে দিবাকরের গলা প্রায় কেঁপে যাচ্ছে, সে সত্যিকারের অনুভূতির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু তপন এবার হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিতে দ্বিধা করল না। বেশ খানিকটা সময় ধরে সে দিবাকরের দিকে চেয়ে রইল, হাসল, হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিল, সিগারেট ধরাল। তারপর ধীরেসুস্থে বলল, তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তখন প্রাণ

দেবার একটা নেশা ছিল। নেশা কিংবা ফ্যাশান–যাই বলিস! তখন যেকোনো শক্তসমর্থ যুবকই যদি দেশের ব্যাপার নিয়ে না মাততো– তা হলে লোকের কাছে শ্রদ্ধা পেত না। এটা মস্তবড়ো নেশা–এই নেশার ঝোঁকে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে অনেকে। আমার বাবা-জ্যাঠাকে ঠিক বোকা যদি নাও বলি, তা হলেও হঠকারী এবং ভাববিলাসী নিশ্চয়ই বলা যায়। এখন বেঁচে থাকাটাই একটা মস্ত বড়ো নেশা। আমি ভাই সেই বেঁচে থাকার নেশাতেই মজে আছি।

সেই বেঁচে থাকা মানে কি পশুর মতন শুধু আত্মসুখের জন্য বেঁচে থাকা?

তাও বলতে পারিস! পশুর সঙ্গে মানুষের কতখানিই-বা তফাত! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া বলছিস? আর একটা ঘটনা বলছি শোন। আমার ঠাকুরদা ধুঁকতে ধুঁকতেও বেঁচে থেকে দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন। শেষ কটা দিন ওঁকে একটু শান্তি দেবার জন্য টি বি হাসপাতালে একটা সিটের জন্য গিয়েছিলুম এক মন্ত্রীর কাছে। সাহেবি আমলের চেয়েও এখানকার মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করা আরও অনেক শক্ত। আমার জ্যাঠামশাই প্রিয়নাথ রায়চৌধুরি ঢাকার যে মিছিলে সাহেবের হাত থেকে চাবুক কেড়ে দিয়েছিলেন–এখনকার এই স্বাস্থ্যমন্ত্রীমশাইও সেদিন সেই মিছিলে ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন–সুতরাং আমার জ্যাঠামশাইকে অন্তত তিনি চিনতে পারবেন ভেবে বিস্তৃতভাবে আমার বাবা-জ্যাঠামশায়ের কথা লিখে ওঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমি আর কাকা দু-জনে দিনের-পর-দিন ধর্না দিয়েছি-শেষপর্যন্ত একদিন দেখা পেলাম, উনি ভীষণ ব্যস্ত–একটা ইলেকশন ট্যুরে বেরোবেন, দু- এক দিনের মধ্যে কথা বলার সময় নেই পর্যন্ত–তবু উনি দয়া করে ব্যবস্থা করলেন।-সরকারি কী একটা ফাণ্ড থেকে ঠাকুরদাকে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা সাহায্য করা হবে এবং উনি ইলেকশন ট্যুর থেকে সপ্তাহ তিনেক বাদে ফিরে এসেই হাসপাতালে ঠাকুরদাকে একটা সিট দেবার খুব চেষ্টা করবেন। সরকারি সাহায্য একবারও আসবার আগে, সেই তিন সপ্তাহ পূর্ণ হবার আগেই অবশ্য ঠাকুরদা রক্তবমি করতে করতে মারা যান!–এসব শুনে কী মনে হয় না, প্রাণ দেবার বদলে আমার বাবা জ্যাঠারও উচিত ছিল বেঁচে থেকে মন্ত্রী হওয়া?

এইসব সামান্য বিচ্যুতির কথা তুলে তুই অত বড়ো আদর্শের বিচার করছিস? ওঁরা কোনো প্রতিদানের কথা ভেবে তো প্রাণ দেননি! দেশকে ভালোবাসাই একমাত্র ভালোবাসা–যার বিন্দুমাত্র প্রতিদান নেই। সেইজন্যেই সব ভালোবাসার চেয়ে এই ভালোবাসা এত তীব্র। একটা মেয়েকে ভালোবেসে ক-জন আর প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেয় হাজার হাজার মানুষ।

হু, যারা বেশি সুযোগসন্ধানী, তারাই অন্যের কাছে দেশপ্রেমের বুলি বেশি কপচায়। তুই শালা, বিলেতে বসে দেশপ্রেম নিয়ে এত বুকনি ঝাড়ছিস কেন আমার কাছে? তুই এখানে কী করছিস?

ডিস ভরতি চিংড়ির বড়া নিয়ে ঘরে ঢুকে ললিতা বলল, কী, এত ভালোবাসার গল্প হচ্ছে কীসের? দুই বন্ধুতে সব গোপন কথা বলা হচ্ছে বুঝি?

দিবাকর তাড়াতাড়ি জবাব দিল, এমনি ভালোবাসা নয়, আমরা দেশপ্রেমের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

তপন হালকাভাবে বলল, দেখো তো ললিতা, দুই বন্ধুতে বসে কোথায় একটা নিরিবিলিতে মেয়েদের গল্প করব, আমাদের সব পুরোনো প্রেমের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব–তা নয়। দিবাকর যতসব দেশপ্রেম-টেশপ্রেমের মতন গুরুগম্ভীর ব্যাপার তুলেছে।

ললিতা আরক্ত মুখে বলল, আপনি ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু বোঝেন নাকি? আপনাকে দেখলে তো মনে হয়, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

চেহারা দেখে মনে হয়? দিবাকরের চেয়েও আমার চেহারা খারাপ বলতে চাও?

আমি চেহারার কথা বলছি না! চেহারা আপনার তো বেশ ভালোই, কিন্তু মেয়েরা শুধু চেহারা দেখে ভোলে না কখনো।

তপনের হঠাৎ মনে হল, ললিতা মেয়েটি কীরকম যেন অস্বাভাবিক। আজ গোড়া থেকেই ললিতা ওর সঙ্গে একটু তির্যকভাবে কথা বলছে। যেন তপন ওর প্রতিপক্ষ। অথচ-কিংবা এমন হতে পারে-ললিতার মতন মেয়েরাই স্বাভাবিক বাঙালি মেয়ে। তপন তো অনেকদিন নিজে এ-রকম কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি, তাই বুঝতে পারছে না। ললিতা যেন শালীনতার প্রতিমূর্তি। ললিতা আর দিবাকর দু-জনেই পবিত্র প্রেম কিংবা পবিত্র দেশপ্রেম ছাড়া আর কিছু জানে না। এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি একেবারেই পছন্দ করে না। তপন একবার ভাবল, সে চুপ করে যাবে। তারপর আবার ভাবল, এদের খুশি করার কোনো দায়িত্ব তো তার নেই। তার যা খুশি সে তাই বলবে। সেইরকম ঠাণ্ডা কৌতুকের সুরেই তপন বলল, তবু জানো ললিতা, আমার এই চেহারা দেখেই অনেক মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে। অনেক ভালো ভালো মেয়ে! এক সপ্তাহ-দু-সপ্তাহের জন্য তারা খুব গভীরভাবে ভালোবেসেছে আমাকে।

এক সপ্তাহের ভালোবাসা! ছি ছি! ওকে ভালোবাসা বলে না। ওর নাম বিকৃত লালসা। আপনি এ-রকম কথা বলবেন, আমি ভাবতেও পারিনি। সত্যিকারের ভালোবাসা মানুষের জীবনে শুধু একবারই আসে, একজনের কাছ থেকে-এদেশের যেসব মেয়েদের আপনি দেখছেন- ~~~

সত্যিকারের ভালোবাসা কিনা তা জানি না। জীবনের সত্য বড় ঘন ঘন বদলায়। আজ যা সত্যি কাল সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। এদেশের মেয়েদের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, মিথ্যে হলেও, ক্ষণস্থায়ী হলেও তারা সেই মিথ্যে ভালোবাসাও খুব মধুরভাবে ব্যবহার করতে জানে! শরীরটাকে তারা একটা লজ্জার ব্যাপার মনে করে না, সৌন্দর্য যে শুধু একটা দেখবার জিনিস না-সম্পূর্ণ সত্তাকে ডুবিয়ে উপভোগ করবার-তা তারা জানে-মিথ্যে হলেও এইরকম ভালোবাসাই আমার ভালো লাগে-এর বদলে বাঙালি মেয়েদের প্যানপ্যানানির কোনো মূল্যই নেই আমার কাছে!

আপনি এ-রকম ক-জন মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছেন?

ঠিক গুনিনি, দশ-বারো জন হবে। সবার নামও এখন মনে নেই।

আপনি এসব মেয়ের সঙ্গে-আপনি-আপনি-

ললিতা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে, তপনের প্রত্যেকটা কথাই যেন তার গায়ে তিরের মতন ফুটছে। তবু এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার কোনো আগ্রহই তার দেখা গেল না। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে তপনের এইসব ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসার কাহিনি শুনতে চাইছিল। কিন্তু দিবাকর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, অদ্ভুত পরিবর্তন! পাঁচ বছর আগে যাকে চিনতাম, সে যেন অন্য তপন! বিদেশের যা-কিছু সবচেয়ে খারাপ, তপন ঠিক সেগুলোরই মোহে পড়েছে! মদের নেশা, মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা-অথচ এদেশের লোকদের মধ্যে অনেক ভালো গুণও আছে-সেগুলো তার চোখে পড়েনি-তোর জন্যে আমার দুঃখ হয় রে তপন।

তপন হা-হা করে হেসে বলল, তুই তো একটা সিগারেটও খাস না-আশা করি তুই খুব ভালো আছিস! এইরকম ভালো থেকেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিস! আমার মতন একটা-আধটা ছেলে যদি বখে যায়-তাতে অত বড়ো দেশের কিছু আসে-যায় না!

এরপর আর গল্প জমতে পারে না! খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল বিনা আড়ম্বরে, দু-একটা মামুলি কথা ছাড়া কেউ আর কিছুই বলল না। তপন ললিতার রান্নার প্রশংসা করল-তাতেও ললিতার বিশেষ কোনো ভাবান্তর হল না- সে সবসময় তপনকে লক্ষ করছে অথচ চোখাচোখি হলেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তপন স্পষ্ট বুঝতে পারল দিবাকর অপেক্ষা করছে তপন কখন বিদায় নেবে। একসময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল দু-জনের। এখন সুর কেটে গেছে। পাঁচ বছরের মধ্যেই ওদের মধ্যে দুটি মহাসমুদ্রের ব্যবধান। বাকি হুইস্কিটুকু শেষ করে তপন উঠে পড়ল। তপন কলকাতায় যাবে শুনে ললিতা তার ভাই-বোনের জন্য জামাকাপড় তপনের হাত দিয়ে পাঠাবে বলে একটা প্যাকেট তৈরি করে রেখেছিল-শেষ মুহূর্তে সেটা দিতে ললিতা যেন একটু দ্বিধা করতে লাগল। তপনই সেটা চেয়ে নিল আগ্রহ

করে। এবং তপনের এইটুকু উপকারের কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যই যেন দিবাকর ওকে টিউব স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

রাস্তায় বেরিয়ে দিবাকর ললিতা সম্পর্কে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল–তপন সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিবাকরের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। দিবাকরকে শুধু চাকরি করতে হয় না, রিসার্চ করার সুযোগ পায়–বিখ্যাত অধ্যাপক বেন্টলির কাছ থেকে দিবাকর কোনো সাহায্য পাচ্ছে কিনা–এইসব সম্পর্কে তপন এমন আগ্রহী হয়ে পড়ল যেন-সেই মুহূর্তে সে বিজ্ঞান ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই জানে না। বিদায় দেবার আগে দিবাকর জিজ্ঞেস করল, তোর বেশি নেশা হয়নি তো–তুই পারবি তো একা যেতে?

তপন বিমূঢ়ভাবে তাকাল দিবাকরের কাছে। এ প্রশ্ন শোনার জন্য যেন সে একটুও প্রস্তুত ছিল না। নেশা সম্পর্কে কী অদ্ভুত ধারণা। এতক্ষণ সে একসঙ্গে দিবাকরের সঙ্গে হেঁটে আসছে, কথা বলছে–এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবু মদ খেয়েছে বলেই ওর নেশা হবে, দিবাকর এই ধারণা নিয়ে বসে আছে। তপনের হঠাৎ মনে পড়ল, ফিজিক্স-এর বদলে দিবাকরের ফিলজফি পড়া উচিত ছিল। মুখে শুধু বলল, না, ঠিক আছি।

দিবাকর তার গলায় মাতৃস্নেহের মতন আকুতি এনে বলল, তপন, আর যাই করিস, শরীরটার ওপর অন্তত যত্ন নিস!

পুরুষমানুষের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শোনা তপনের একেবারেই অভ্যেস নেই–সেইজন্য ওর খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। খুব বিব্রতভাবে বলল, না, না, তুই কী ভাবছিস আমার সম্বন্ধে, সব ঠিক আছে।

যেন জীবনের মতন শেষ বিদায় নিচ্ছে–এইভাবে দিবাকর তপনের কাঁধে হাত রাখল খুব মমতায়। সেই হাত সরে যাবার আগেই–হঠাৎ তপনের সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে এল, চট করে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

রাস্তা জনবিরল হয়ে এসেছে। পথচারীর সংখ্যা খুব কম, গাড়িগুলো এইসময় ছোটে অত্যন্ত দ্রুতবেগে। হলোয়ে রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে ওরা কিংসস-এ ট্রেন ধরবে ঠিক করেছিল। টিউব স্টেশনের সিঁড়ির মুখে গোটা পাঁচেক ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে, রেলিং-এর ওপর পা তুলে নীচু গলায় গান গাইছে। তপনের শ্রবণশক্তি খুব সজাগ–সে এক ঝলক শুনেই গানটা চিনতে পারল :

হু উইল হ্যাং আপ দা নিগারস ফ্রম দা নিয়ারেস্ট অ্যাপল ট্রি
উইল হ্যাং আপ দা নিগারস ফ্রম দা নিয়ারেস্ট অ্যাপল ট্রি

হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি পড়লে মানুষের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় যেমন সজাগ হয়ে যায়–তপন সেইরকম দাঁড়িয়ে আছে। দিবাকর ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু ছোকরাগুলোর দিকে তাকিয়েই সে বিপদ আঁচ করে বলল, দাঁড়ালি কেন, চল, এর পর আর ট্রেন পাবি না। তপন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, মৃদু স্বরে বলল, এক্সকিউজ মি, পথ ছাড়ো

ওরা তপনের কথায় কান দিল না, গান গাইতেই লাগল, এবার একটু জোরে।

তপন আবার বলল, পথ ছাড়ো, আমরা স্টেশনে যাব।

তপনের কথায় ওরা কান দিল না, একজন শুধু গান থামিয়ে আরেকজনকে বলল, ডিডনচাই টেল ইয়া এরিক? দে স্মেল ডিফরেন্ট! দে স্মেল টু স্টিংকিং প্যাকিস্তানিজ। যাকে বলা হল, সেই গলায় রুমাল বাঁধা ছোকরা বলল, না, আমি বাজি ফেলতে পারি–পাকিস্তানি নয়, ইণ্ডিয়নস!

বাট দে স্মেল ডিডনচাই টেল ইয়া?

তপন তখনও ধীরভাবে বলল, রাস্তা ছাড়ো, আমাদের যেতে চাও।

চেঁচাসনি! চেঁচাসনি! তোরা নিগাররা কবে শিখবি যে ইংল্যাণ্ড একটা সভ্য দেশ, এখানে চেঁচিয়ে কথা বলে না কেউ।

আমি চেঁচাইনি! তোমাদের নিশ্চয়ই কানের অসুখ আছে।

দিবাকর তপনের হাত ধরে টেনে বলল, কথা বলিসনি, ওদের সঙ্গে কথার বলিসনি!

তপন দিবাকরের দিকে চেয়েও দেখল না-স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইল! ওদের মধ্যে একটা ছেলে এগিয়ে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে নকল মিষ্টি গলায় তপনকে জিজ্ঞেস করল, এন ইট রাইট মিস্টার, ইয়ু স্মেল ডিফারেন্ট টু আস?

তপনও ঠিক সমান সুরে উত্তর দিল, হতে পারে। কিন্তু তোমার গা থেকেই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ইটস দা আদার ওয়ে অ্যাবাউট!

ছেলেটা অপমান যেন গায়ে মাখল না, বিকট ভাবে হেসে উঠে বলল, তা হলে তোরা দেশে ফিরে যাচ্ছিস না কেন? ডার্টি সোয়াইনস-ব্রিটেন ফর দা ব্রিটিশ- ইউ।

দিবাকর ব্যাকুলভাবে তপনের হাত জোর করে টানতে টানতে বলল, তপন, এখান থেকে চলি চ-এরা গুন্ডা, আমরা অন্য স্টেশন থেকে উঠব। তপন অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে ওদের দু-জন দিবাকরকে ঘিরে ধরেছে। দিবাকর একটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো কোট পরে ছিল, ভারতীয়রা যাকে ল্যংকোট বলে-গলাবন্ধ লম্বা কোট। একজন দিবাকরের সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, গাছে উঠে ঝোলার পক্ষে এই পোশাকটাই মানায়, তাই না? সেই চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা ছেলেটা আবার মিষ্টিভাবে বলল, হেই মিস্টার ডু য়ু ওয়্যার এনি ড্রয়ারস অর এনিথিং আণ্ডার ড্যাট গিয়ার? টেল মি-।

দিবাকর অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে, তপন এগিয়ে এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, তোমরা কী চাও? শুধু শুধু ঝামেলা পাকাতে চাও? আমরা স্টেশনে ঢুকব, আমাদের যেতে দাও।

লাল রুমাল বাঁধা ছেলেটা বলল, হেঁটে যা, হেঁটে যা! ব্রিটিশ ট্রেন তোদের জন্য না! ব্লাডি ইণ্ডিয়ানস! বাস্টার্ডস!

তপনও সমান গলায় বলল, ইয়ু বাস্টার্ডস! ওয়ান্ট সাম লিটল স্পোর্ট?

ওয়াচ আউট!

লাল রুমাল বাঁধা ছেলেটাই তপনকে প্রথম ঘুসিটা মারল। তপন শিগগিরই চলে আয় আর্ত গলায় পেঁচিয়ে দিবাকর তখন ছুটতে শুরু করেছে। নাকে লেগেছে ঘুষিটা–সঙ্গে সঙ্গে গরম রক্ত বেরিয়ে এসেছে, হাত দিয়ে সেই রক্ত ছুঁয়েই তপন হিংস্র হয়ে উঠল। বুনো শুয়োরের মতন ছুটে গিয়ে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, লাল রুমাল বাঁধা ছেলেটার থুতনির তলায় প্রকান্ড একটা ঘুসি মেরে তাকে শুইয়ে ফেলল রাস্তায়, একজন তার কাঁধে মারতেই তপন সেদিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, আজ তোদের শেষ করব, সব কটাকে।

মারামারিটা বেশিদূর এগোল না। কাছেপিঠেই আপাদমস্তক বর্ষাতিতে ঢাকা একজন পুলিশম্যান ছিল, হঠাৎ সে কোথা থেকে উদয় হল। দু-পাঁচ জন দর্শকও জমে গেল। পুলিশ দেখেই ছেলেগুলো নিরীহ সেজে গেল–সমস্বরে তারা তপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল, ইণ্ডিয়ান থাগ, আমাদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল, ইয়ু নো, হোয়াট দিজ ইণ্ডিয়ানস আর–

সাদা ধপধপে দাঁতের পাটি বার করে হাসল পুলিশটা। তপনকে সে এক হাতে ধরে আছে। ছেলেগুলোকে বলল, ওসব চলবে না, ওসব চলবে না, বিগ মাসলস, এ? একটা ইণ্ডিয়ান তোমাদের পাঁচ জনকে আক্রমণ করেছিল? তোরা ব্রিটিশ নোস? এ-রকম মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা করে না? গেট গোয়িং, গেট গোয়িং–তপনের দিকে ফিরে বলল, আর য়ু অল রাইট স্যার? আপনি কোনো অভিযোগ জানাতে চান?

তপন বলল, না।

দিবাকর আবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তপন হাত নেড়ে তার কাছে বিদায় জানিয়ে স্টেশনে এসে ঢুকল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্রেন পেয়ে গেল। একটা অকারণ, অনির্দিষ্ট রাগ সবসময়ই তপনের মধ্যে জ্বলে-সেটা আরও হু-হু করে জ্বলে উঠল, তপনকে পোড়াতে লাগল। তপনের চোখ-মুখ এখন টকটকে লাল। সিগারেট শেষ করে টুকরোগুলো মাটিতে ফেলে যখন পা দিয়ে সেগুলো পিষছে-তখন মনে হচ্ছে সে যেন কোনো জীবন্ত প্রাণীকে জুতো দিয়ে থেতলাচ্ছে। সে নিজে যতটা মার খেয়েছে, সেই তুলনায় ওদের, সে কম মার দেয়নি-তবু তার রাগ একটুও কমছে না।

ট্রেন থেকে নেমে আবার ওপরের রাস্তায় এসে কয়েক পা হাঁটার পরই তপন বুঝতে পারল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না-তবু এ ব্যাপার ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়। আরও কিছুটা হাঁটার পর আবার ঝট করে পিছন ফিরে সেই গলায় লাল রুমাল বাঁধা ছেলেটাকে এক পলকের জন্য দেখতে পেল। তপন আমেরিকায় থাকার সময় কিছু জুডোর প্যাঁচ শিখে নিয়েছিল-আত্মরক্ষার ব্যাপারে সে খুব বেশি ভীত না-কিন্তু লণ্ডনের রাস্তায় মারামারি করে সে যে কিছুতেই সুবিধে করতে পারবে না-তাও বুঝতে পারল। আর মিনিট তিনেক হাঁটলেই হোটেলে পৌঁছোনো যায়। তপন দ্রুত পা চালিয়ে দিল সেদিকে।

হোবার্ন স্ট্রিটের মোড় ঘোরার আগেই কোণ থেকে তিন জন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সেই লাল রুমাল বাঁধা ছেলেটা তার দু-জন সঙ্গী ট্রেনে তপনকে অনুসরণ করে এসেছে। তপন বাধা দেবার সুযোগ পেল না-প্রথমেই বাঁ-চোখের ওপর একটা প্রচন্ড ঘুসি পড়ায় সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল ওদের ওপর, এক জনের দাঁতের ওপর তার মুষ্টি পড়ায় কেটে গেল আঙুলতলপেটে একটা লাথি লাগতেই তপন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। অজ্ঞান হবার ঠিক আগের মুহূর্তে তপনের মনে হল, একটা রিভলবার কিংবা ছুরি থাকলে সে শেষ করে দিত সব কটাকে।

এবারও একটা পুলিশম্যানই তপনকে বাঁচাল। দূর থেকে তাকে আসতে দেখেই ছিটকে সরে গেল ছোকরারা। শিষ দিতে দিতে তারা পুলিশকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেভমেন্টে অন্ধকারে পড়ে রইল তপন, পুলিশটি তাকে দেখতে পায় না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তপনের জ্ঞান ফিরে এল এবং প্রথমেই সে ভাবল, যাক, তা হলে মরে যাইনি। আমি কিছুতেই মরতে চাই না। মুখে-চোখে হাত বুলিয়ে দেখল–কোথাও বিশেষ রক্তারক্তি হয়নি, বাঁ-চোখটায় শুধু অসম্ভব ব্যথা। আস্তে আস্তে হাঁটুতে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রইল কিছুক্ষণ, ক্রমে দৃষ্টি ও চিন্তা পরিষ্কার হয়ে এল। এর আগে আর একবার মাত্র এই ধরনের মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল তপন, সেবারও দেখেছে, এবারও লক্ষ করল, খুব মার খেলে শরীরটা বেশ হালকা লাগে। এখন সে যেন লাফিয়ে অনেক দূর শূন্যে উঠে যেতে পারে। আর, এরকম মার খাবার ঠিক পরেই শরীরে আর তেমন রাগ থাকে না–মনটা হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে যায়, আহত জায়গার জন্য যত না যন্ত্রণা–তার চেয়ে একটু বেশি হাসি পায় যেন। সেইরকম হালকা শরীর ও মন নিয়েই তপন এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটটা খুঁজল-ললিতা কলকাতার নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্যাকেটটা তপনকে দিয়েছিল। প্যাকেটটা আশেপাশে কোথাও নেই। তপনের স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম মারামারির পর দিবাকর সেটা কুড়িয়ে তার হাতে দিয়েছিল। ট্রেন থেকেও সেটা নিয়ে সে নেমেছিল ঠিকই। তাহলে কোথায় গেল? এদিক-ওদিক খানিকটা খোঁজাখুঁজি করেও তপন সেটার চিহ্ন দেখতে পেল না। মাটিতে থুতু ফেলে তপন ভাবল, শালারা শুধু গুন্ডাই নয়, চোরও। এখন ললিতা কী মনে করবে? হয়তো সে ভাববে, মাতাল অবস্থায় তপন সেটা হারিয়ে ফেলেছে।

৭-৮. হোটেলের দরজা সারারাত খোলা

হোটেলের দরজা এমনিতেই সারারাত খোলা থাকে। আজ শনিবার, লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই। রাস্তার ঈষৎ অন্ধকার প্রান্ত থেকে আলোয় উজ্জ্বল হোটেলের দরজার কাছে আসবার আগে তপন দ্বিতীয় রুমালটি নিয়ে আর একবার মুখ মুছে নিল ভালো করে। আগে একটা রুমাল রক্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তপন সেটা ফেলে দিয়েছে, বাঁ-চোখে ভোঁতা ধরনের ব্যথা, আঙুল দিয়ে তপন অনুভব করে দেখল–ভুরুর কাছে এর মধ্যেই বেশ ফোলা।

হোটেলের দরজা ঠেলে ঢুকেই তপনের যেন কীরকম একটা অনুভূতি হল। তপন যথাসম্ভব মাথাটা নীচু করে মাতালের ভঙ্গিতে ঢুকেছিল–যাতে অন্য কেউ তার আহত মুখখানা লক্ষ না করে, তবুও তপন কিছু-একটা অনুভব করে চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখল। লাউঞ্জে অ্যালিস বসে আছে। তপনকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, তপন তার দিকে এক পলক চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। সোজা কাউন্টারের সামনে এসে নিজের ঘরের চাবি চাইল, ডেস্ক ক্লার্ককে গুড নাইট জানিয়ে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

অ্যালিস ততক্ষণে তপনের পাশাপশি চলে এসেছে। অ্যালিস কিছু বলবার আগেই তপন বলল, কী খবর, অ্যালিস? এত রাত্রে? শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর তপনের, কোনো অভিযোগ বা অভিমান বা ক্রোধ নেই, যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা বলছে। অ্যালিস কিছুই বলল না, সে তপনের সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে লিফটের দরজার কাছে। তপনই আবার নরম গলায় বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে অ্যালিস, এখন বাড়ি যাও!

এতক্ষণ সোজাসুজি তপনের মুখের দিকে তাকায়নি অ্যালিস, এই প্রথম সে তপনের অস্বাভাবিক মুখখানা দেখতে পেয়ে একটা আর্তনাদ করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে হাত

চাপা দিল। পাতলা সাদা দস্তানা পরা হাত অ্যালিসের, মনে হয় ধবল তুষারের মতো। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তোমার চোখে কী হয়েছে? কী করে হল?

লিফটের জন্য বোতাম টিপে তপন বলল, বিশেষ কিছু না, সিঁড়িতে পা স্লিপ করে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। অনেক রাত হয়েছে, তুমি এখন বাড়ি যাও!

তোমার এক্ষুনি কোনো ডাক্তার দেখানো উচিত।

ডাক্তার দেখিয়ে এসেছি, তিনি বলেছেন, কিছুই হয়নি, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

স্বয়ংক্রিয় শূন্য লিফট নীচে নেমে এল, দরজা খুলে গেল। তপন লিফটের মধ্যে এক পা বাড়িয়ে ঠিক আগেকার মতনই শান্ত নিরুত্তাপ গলায় বলল, বাড়ি যাও, অ্যালিস, গুড নাইট!

অ্যালিস উত্তর দিল না, দরজা বন্ধ হবার আগেই সে তাড়াতাড়ি লিফটের মধ্যে এসে ঢুকল, নিজেই বোতাম টিপে দিল। চতুষ্কোণ লিফটের বন্ধ বাতাসের মধ্যে ওরা শুধু দু-জন। কেউ আর কোনো কথা বলল না। অ্যালিস উৎসুকভাবে তপনের দিকে চেয়ে আছে, তপন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। অত কাছাকাছি, ওদের পরস্পরের নিশ্বাস পর্যন্ত মিলে-মিশে যাচ্ছে এক সঙ্গে, তবু কোনো কথা নেই।

চারতলায় এসে লিফট থামতেই তপন বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস। করিডোরে দাঁড়িয়ে তপন প্রায় মিনতির ভঙ্গিতে বলল, আমি এখন একা থাকতে চাই, প্লিজ অ্যালিস, তুমি বাড়ি যাও!

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তপন হাঁটতে শুরু করল, উত্তর না দিয়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে এগোল অ্যালিস। লম্বা বারান্দাটা সম্পূর্ণ নির্জন, চাপা আলোয় ছাওয়া, পিছনে না তাকিয়েও তপন অ্যালিসের জুতোর খট খট শব্দ শুনতে লাগল। নিজের ঘরের সামনে

এসে দরজার ফুটোয় চাবি ঢুকিয়েছে। অ্যালিস তখন আবার ফিসফিস করে বলল, প্লিজ, প্লিজ, টপন, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দাও!

তপন যেন ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত-সেইরকমভাবে করুণ ও মিনতিভরা গলায় বলল, আমার সত্যিই এখন ভালো লাগছে না অ্যালিস, আমি এখন সম্পূর্ণ একা থাকতে চাই! প্লিজ, আমি অনুরোধ করছি এখন বাড়ি যাও!

দরজা খুলে তপন ঘরে ঢুকতেই খানিকটা জোর করেই অ্যালিসও ঢুকে এল, দরজা বন্ধ করে সেখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখে দু-ফোঁটা জল টলটল করছে। একটু হাওয়া দিলেই যেন তা গড়িয়ে পড়বে।

তপন দু-এক সেকেণ্ড স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, যেন সে এক্ষুনি তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়াবে। অ্যালিসের শরীরটা দুলছে, যেন তপন তার দিকে হাত বাড়াবার সামান্য চেষ্টা করলেই সে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তপনের মুখের কোমল ভাবটা হঠাৎ বদলে গেল, অস্বাভাবিকভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল, গেট আউট! উইল য়ু? হাউ অ্যাবাউট লিভিং মি ইন পীস! তপনের চিৎকারে যেন সারা-হোটেলটাই কেঁপে উঠল। অ্যালিস এগোতে এগোতে বলতে লাগল, টপন, আমাকে একটু দয়া করো, আমাকে একটু সময় দাও!

বেরিয়ে যাও বলছি, কুত্তি কাঁহাকা! তোকে হাজার বার বলেছি, তোর ওই জঘন্য মুখ আমি আর দেখতে চাই না!

প্লিজ টপন, আমাকে একটা কথা বলতে দাও।

না! আমি তোকে

টপন, ক-দিন আগেও তুমি আমাকে-সেই কথা ভেবে-শুধু একবার।

আমি সহ্য করতে পারছি না তোকে, আ আম টায়ার্ড, আ আম টায়ার্ড অব য়ু! এভরি টাইম আই সি য়ু, ইউ গড ড্যাম লিটল বিচ, য়ু ক্রল অল ওভার মি! নাউ, গেট আউট। ভালো চাও তো এক্ষুনি বিদাও হও!

অ্যালিস আর পারল না, ভেঙে পড়তে পড়তেও তপনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, তপন তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। অ্যালিস ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, টপন, তুমি আমাকে বরং মারো, মারো, তবু ওই বিশ্রী আমেরিকান ভাষায় গালাগাল দিয়ো না!

গালাগাল দেব না! গালাগাল শোনার জন্য কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? আমি বারবার বারণ করিনি! নির্লজ্জ বেশ্যা কোথাকার!

তোমাকে বলতেই হবে, আমার কী দোষ!

তোমার কোনো দোষ নেই!

টপন, কেন তুমি আমাকে দেখলেই পাগলের মতন ব্যবহার করছ!

তার কারণ, আমি পাগল! হয়েছে তো! বিদেয় হও!

টপন, তুমি সব কথা খোলাখুলি বলছ না কেন?

আমার কিছু বলার নেই। আমার মেজাজ এখন ভয়ংকর খারাপ, আমি একা থাকতে চাই, কেন আমাকে জ্বালাতে এসেছ?

আমি তোমাকে ভালোবাসি–গত চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আমি একটি মুহূর্তও তোমাকে ভুলতে পারিনি–এই ভালোবাসা আমাকে সর্বস্বান্ত করে দেবে–তুমি দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে–তোমাকে বলে যেতেই হবে, তুমি কেন আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ, কেন তুমি আমার ভালোবাসা গ্রহণ করতে চাও না।

আঃ ভালোবাসা, আর ভালোবাসা! ভালোবাসা কি একটা চেয়ার না টেবিল না ঘড়ি না এক বোতল মদ–যে আমি নেব? তোমাকে আমি সহ্য করতে পারি না–তোমার ভালোবাসা কি আমি ধুয়ে খাব? আই কেয়ার আ লিটল ফর ইয়োর লাভ। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, তুমি এখন ভালো চাও তো যাও, আমি তোমাকে অনেকবার সাবধান করেছি।

অ্যালিস আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে এল তপনের দিকে। সারামুখ তার কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। হেঁচকি তোলা কান্নায় সে বলল, তোমাকে ভালোবাসতে হবে না, তুমি শুধু একবার আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলো, একবার আমার দিকে তাকাও।

রাগের সময় তপনের কোনো কান্ডজ্ঞান থাকে না। সে অন্ধ গোঁয়ার হয়ে যায়। অ্যালিসের অশ্রুময় সুন্দর মুখখানি দেখে তপন একটুও বিচলিত হল না, আরও চেঁচিয়ে বলল, না, না, দেখতে চাই না ওই মুখ। তারপরই তপন প্রচন্ড শক্তিতে এক থাপ্পড় বসাল অ্যালিসের গালে, অ্যালিস ঘুরে পড়তে পড়তেও খাটের বাজু ধরে সামলে নিল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল তপনের দিকে। তপনের বাঁ-চোখটা প্রায় কেটে গেছে–ভুরুর কাছে এত ফোলা। চোখের ভেতরটা টকটকে লাল–চুলগুলো এলোমেলো। অ্যালিস এবার আর কাঁদল না। যেন তার ওপর কিছু একটা ভর করেছে–সেইরকম ঘোরের মধ্যেই সে আবার এগিয়ে এল তপনের দিকে। বলল, আমি যাব না, আমি যাব না। তুমি আমাকে খুন করলেও আমি এখান থেকে যাব না।

তুমি জানো না আমি কীরকম অবস্থার মধ্যে আছি! তুমি যদি এক্ষুনি না যাও, আমি হয়তো সত্যিই তোমাকে খুন করতে পারি। আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এখনই যাও।

তাই করো, আমাকে খুন করো, যদি তুমি তাই করতে চাও। অ্যালিস আচ্ছন্নের মতন একেবারে তপনের সামনে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিল। তপন উন্মত্তভাবে, কোনো বিবেচনা না করেই দুই শক্ত হাত দিয়ে গলা টিপে ধরল অ্যালিসের, অ্যালিস মুখ দিয়ে একটা চাপা আওয়াজ করে ছটফটিয়ে উঠল, তপন এক ঝটকা দিয়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। অ্যালিস হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর কোনো শব্দ করল না। তবুও রাগ গেল না তপনের,

একটা লাথি কষাল অ্যালিসের পড়ে থাকা মূর্তির গায়ে। তারপর বাথরুমের দিকে এগোল হাত-মুখ ধুতে।

এই সময় দরজায় ধাক্কা। তপন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কে? এতরাত্রে আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

কোনো উত্তর এল না, দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল।

তপন রুদ্র মূর্তিতে এসে খটাং করে দরজা খুলে আগলে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, কী চাই? একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ, সৌম্যমুখ–সম্ভবত ইংরেজ নয়, ইউরোপের অন্যদেশীয়, ঈষৎ ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, ইয়ংম্যান, তোমার ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে? এত শব্দ!

তপনের কোনো কান্ডজ্ঞান নেই। কর্কশভাবে উত্তর দিল, কিছু হয়নি, মাইণ্ড ইয়োর বিজনেস।

কিন্তু আমার মনে হল

তোমার কী মনে হল না হল, তা জানার কোনো কৌতূহল আমার নেই। এত রাত্রে আমাকে বিরক্ত করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

কিন্তু তোমার চেঁচামেচিতেই আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।

তাহলে শ্লিপিং পিল খাও।

তোমার ঘরে স্পষ্ট মেয়েলি গলার কান্না শুনতে পেয়েছি, কেউ যেন পড়ে গেল।

বল্ডারড্যাস! গুড নাইট!

লোকটি তবু মুখ বাড়িয়ে তপনের ঘরের মধ্যে দেখার চেষ্টা করল। তপন তার কাঁধে হাত দিয়ে আটকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শোনো, তোমার যদি কোনো কমপ্লেন থাকে তাহলে

ম্যানেজারকে বলো–কিংবা ডাক্তারের কাছে যাও–কিন্তু তোমার ওই নোংরা নাক গলিয়ে আমাকে আর বিরক্ত করতে এসো না।

লোকটি হতভম্বের মতো তপনের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি আগাগোড়া নম্রভাবেই কথা বলছিল, তপনের কাছ থেকে এইরকম ব্যবহার সে আশা করেনি। তার প্রায় মুখের উপরই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল তপন। মাটিতে পড়ে থাকা অ্যালিসের দিকে সে আর তাকিয়েও দেখল না। আবর্জনার স্তূপের মতন তাকে পাশ কাটিয়ে আবার চলে এল বাথরুমের কাছে। ক্রোধে তখনও তপনের নাকের ডগা, চোখের কোণ আর আঙুলের ডগাগুলো জ্বালা করছে। সিঙ্কের কাছে এসে ঠাণ্ডা জলের কল খুলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল কয়েকবার। বাথরুমের আয়নায় নিজের অস্বাভাবিক বিকৃত মুখখানা দেখেও সে বিচলিত হল না, কাটা ঠোঁট কিংবা ফোলা চোখ নিয়ে সে এক মুহূর্ত চিন্তাও করল না। গরম হালকা হাওয়ার মতন অসহ্য রাগ আর শরীরের মধ্যে ঘুরছে, এখন তার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। এক-এক সময়ে এইরকম দুর্দান্ত ধরনের রাগ হয় তপনের, তখন আর কোনো যুক্তিবোধ থাকে না। এরকম রাগ হলে তার শরীর এক মুহূর্ত স্থির হতে পারে না। নিশ্বাস পর্যন্ত আটকে আসে।

মাটিতে পড়ে-থাকা অ্যালিসের দিকে ঘুরে চলে এল তপন। অ্যালিসের সঙ্গে হ্যাণ্ডব্যাগটাও ছিটকে পড়েছে টেবিলের নীচে। সাদা, প্রায় স্বচ্ছ একটা গাউন পরেছে অ্যালিস, সেটা হাঁটুর অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে–দেখা যায় অ্যালিসের তুষার শুভ্র ঊরু। একখানা পা তার বিশ্রীভাবে দুমড়ে রয়েছে, মুখটা দেখা যায় না, অঞ্জলি দেবার মতন দু-টি হাতের ভঙ্গি। সোনালি চুলের গোছা উলটে গেছে, দেখা যায় তার মাখনের মতো নরম ঘাড়। অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে তপনের মন একটুও টলল না। সেই নিস্পন্দ মূর্তির দিকে চেয়ে সে ভাবল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? ন্যাকামি? ওসব ন্যাকামি তার ঢের দেখা আছে। লণ্ডনে তো সাদা চামড়ার ষাঁড় অনেক আছে, তাদের কারুর সঙ্গে ওসব ন্যাকামি করো না! তপন পায়ের ধাক্কায় অ্যালিসকে উলটে দেবার চেষ্টা করল। সামান্য একটু কাৎ হয়ে সেইভাবেই পড়ে রইল অ্যালিসের দেহ।

তপনের মাথার মধ্যটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, পা-দুটো খুব দুর্বল, যেন সে আর দাঁড়াতে পারবে না। আবার বাথরুমে এসে কল খুলে কলের তলায় অনেকক্ষণ মাথা দিয়ে রইল। কনকনে ঠাণ্ডা জলে মাথার মধ্যে অসংখ্য ছুঁচ ফুটছে। জল নিয়ে কুলকুচি করতে লাগল, আঁজলা পেতে সেই জল খানিকটা খেয়ে নিল। বেশ খানিকটা বাদে তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুখ মুছল, ডেটলের শিশি এনে মুখের ক্ষতস্থানে লাগাল। বাঁ-চোখটা টেনে ধরে আয়নার সামনে ভালো করে দেখল। চোখের অর্ধেকটা টকটকে লাল, তপন বুঝতে পারল ভেতরে হেমারেজ হয়েছে, ঘুসিটা ঠিক চোখের ওপর লাগেনি, লেগেছে ভুরুর কাছাকাছি। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। লাল বাঁ-চোখটা দিয়ে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বলে তপন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, তাহলে বিশেষ কিছু না।

গেলাসে ঠাণ্ডা জল ভরে নিয়ে তপন অ্যালিসের দিকে ফিরে এল। মাটি থেকে তার মুখখানা সামান্য তুলে জল ছিটিয়ে দিল অনেকখানি। জলের ঝাপটাতেও অ্যালিস চোখ মেলল না। তপনের বুকের মধ্যে হঠাৎ একবার ধক করে উঠল, মরে যায়নি তো? সে কি খুব জোরে ধাক্কা মেরেছে? আবার গেলাসে জল ভরে এনে জলটা সবই একসঙ্গে ঢেলে দিল অ্যালিসের চোখে। অ্যালিস তখনও নিস্পন্দ। অ্যালিসের কবজি ধরে সে নাড়ি দেখার চেষ্টা করল।

তপন অ্যালিসকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় এনে শোয়াল। তোয়ালে দিয়ে জল মুছিয়ে দিল ভালো করে। এখন স্মেলিং সল্ট জোগাড় করা অসম্ভব। তপনের কাছে ভালো ওডিকোলন ছিল। রুমালে অনেকখানি ভিজিয়ে এনে অ্যালিসের নাকের কাছে ঘষতে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে তাকাল অ্যালিস। চোখ মেলেই সে দেখল তপন তার মুখের ওপর ব্যথভাবে ঝুঁকে আছে।

তপন জিজ্ঞেস করল, তোমার বেশি লেগেছে, অ্যালিস?

অ্যালিস ওঠার চেষ্টা করল না, মৃদুভাবে বলল, না।

তপন বিষণ্ণভাবে থেমে থেমে বলল, তোমাকে এত করে বারণ করলাম, তবু তুমি আমার ঘরে কেন এলে, অ্যালিস? আমি অনেকবার তোমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছি। তুমি জানো না, আমি কে। আমি হয়তো রাগের মাথায় সত্যিই তোমাকে খুন করে ফেলতে পারতাম! অ্যালিস, তুমি জানো না, আমি তোমার পিতৃহন্তার ছেলে। আমারই বাবা তোমার বাবাকে খুন করেছিলেন।

অ্যালিস আগের মতো মৃদুভাবে বলল, আমি জানতাম।

তুমি জানতে? কী করে?

টপন, আমার কি একটুও বুদ্ধি নেই? আমার ঘরে সেই ছবিটা দেখার পরই তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠলে, তোমার মুখের চেহারা বদলে গেল–তারপর তুমি গল্পটা শোনার জন্য জেদ করছিলে, তারপরই তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেলে–তখনই বুঝেছিলাম তোমারই নিকট আত্মীয়

শুধু আত্মীয় নয়, রক্তের সম্পর্ক, আমার বাবা-–আমি তাঁর একমাত্র ছেলে কিন্তু একথা জেনেও তুমি কেন বারবার আমার কাছে আসছ? আমাকে ভয় করে না তোমার?

ভয়? আমার কাছে অতীতের কোনো মূল্য নেই, ওসব ঘটনা আমার কাছে গল্পের মতনই অবাস্তব-টপন, মৃতেরা আমাদের কেউ নয়-তাদের কথা ভেবে আমরা আমাদের নিজেদের জীবন নষ্ট করতে পারি না-ওই অভিশপ্ত ছবিটা কেন যে আমি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। সেদিনই ওটা ফেলে দিয়েছি-টপন, তুমি ওসব কথা একেবারে ভুলে যেতে পার না?

তপনের মুখের স্বাভাবিক রং অনেকটা ফিরে এসেছে, তার নিশ্বাসে আর আগুন নেই। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে সে বলল, অত সহজে কি ভোলা যায়? রক্তের টান–ব্লাড ইজ আ সুইট জুস-তুমি গ্যেটে পড়নি, ব্লাড ইজ আ সুইট জুস

টপন, তুমি আমাকে আর ভয় দেখিও না।

ভয় না দেখিয়ে আমার উপায় কী? অ্যালিস, আমার বাবা তোমার বাবাকে খুন করেছিলেন -সেজন্য আমি একটুও লজ্জিত নই, আমি একটুও অনুতপ্ত নই-আমার বাবার সেই রাগ আমার শিরার মধ্যে এখনও থেকে গেছে-আমার ইচ্ছে করে একটা ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে আমি এই গোটা ব্রিটিশ জাতটাকে হত্যা করি-দোষী-নির্দোষ সবাইকে, নারী-শিশু কারুকে বাদ দেব না-সেভাবেই আমার বাবা-জ্যাঠামশায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

তুমি কী বলছ, টপন? এ তুমি কী বলছ! শান্ত হও, নিজের মধ্যে ফিরে এসো-এ-রকম করে ভাবলে যে তুমি পাগল হয়ে যাবে। আমি জানি তুমি মোটেই এরকম চাও না, এটা তোমার কথার কথা, তুমি নিজেই তো বলেছ, তুমি আর ভারতবর্ষের কেউ নও, তুমি আর সেখানে ফিরে যাবে না, তোমার কোনো দেশ নেই-তাহলে এ-রকম বীভৎস দেশপ্রেমের কথা তুমি কেন বলছ? চলো, টপন আমরা দুজনেই অন্য কোনো দেশে চলে যাই।

আমরা? অ্যালিস, সত্যি করে বলো তো, তুমি আমার কাছে কী চাও?

কিছু চাই না! আমি তোমাকে ভালোবাসি, শুধু তোমাকে-

মিথ্যে কথা! তুমি আমাকে ভালোবাস না-একে ভালোবাসা বলে না! তুমি এসেছ আপোশ করতে। তুমি ব্রিটিশ, তোমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ আছে-তাই আমাকে তোমার পিতৃহত্যাকারীর ছেলে জেনেও তুমি এসেছ উদারতা দেখাতে? সিলি!

না, না, বিশ্বাস করো, এর আগেও তো অনেক ব্রিটিশ মেয়ের সঙ্গে অনেক ভারতীয় ছেলের ভালোবাসা হয়েছে, বিয়ে হয়েছে-টপন, তুমি অতীতকে বড়ো করে দেখছ, আমি অতীতের কথা ভাবিই না।

অতীত ছাড়া ভারতবর্ষের আর কী আছে! অতীত নিয়েই ভারতবর্ষের গর্ব, অতীত নিয়েই কান্নাকাটি। তুমি যদি বুঝতে এর কারণ-

কিন্তু, এসব বাদ দিয়েও কি দু-জন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা হতে পারে না? টপন তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না কেন? আমি একবার ভালোবাসায় ভুল করেছিলাম-দ্বিতীয়বার ভুল হলে আমি বাঁচব কী করে? এ ক-দিন আমি নিজেকে অনেক যাচাই করেছি-হয়তো আমার ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না-এর মধ্যে তুচ্ছ অতীতকে টেনে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

অ্যালিস, আমার বুকের ভেতরটা শুকনো, ভীষণ শুকনো, সেখানে ভালোবাসার কোনো জায়গা নেই।

টপন, তোমার চোখ-মুখ ওরকমভাবে কাটল কী করে? আমাকে আগে সেকথা বলো, আমি তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।

ও কিছু না। আমার এক বন্ধু, দিবাকর, তার বাড়ির সিঁড়ি থেকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম। -অ্যালিস আমাকে যদি তুমি সত্যি ভালোবেসে থাক, তা হলে তুমি দারুণ ভুল করেছ। এবারেও ভালোবাসায় ভুল হয়েছে তোমার।

তুমি জানো না, পরশু দিন রাত্রে তিন বার তোমাকে টেলিফোন করেও কানেকশান না পেয়ে-আমার হঠাৎ আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। জানি না কেন, জীবনে কখনো আমার এরকমভাবে মরতে ইচ্ছে হয়নি।

তুমি মরার জন্যই আমার কাছে এসেছ?

হ্যাঁ। তুমি আমাকে মারো। মারো। তাতেই যদি তোমার রাগ কমে-শুধু আমাকে মেরে তুমি অন্যদের ক্ষমা করে দাও।

তপন একটুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল। একদৃষ্টে অ্যালিসের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার পক্ষে তোমাকে ভালোবাসা সম্ভব নয়, আমাকে তুমি ক্ষমা করো! আমি

এই সময়ে দরজায় আবার ঠক ঠক শব্দ হল। তপন দ্রুত পায়ে এসে দরজা খুলে দেখল, সেই প্রৌঢ় লোকটি, হোটেলের ভ্রূকুঞ্চিত ম্যানেজার এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল। রাসভারী পুলিশটি প্রশ্ন করল, হেই, হোয়াটস গোয়িং অন ইন হিয়ার?

ওদের দেখেই তপনের চোয়াল আবার কঠিন হয়ে গেল। নীরস গলায় বলল, কিছু না।

কিন্তু, এই ভদ্রলোক অভিযোগ জানিয়েছেন, তোমার ঘরের মধ্যে মারামারি কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা গেছে।

কিছু হয়নি। আমার এ ধরনের ধারণা ছিল, এটা লণ্ডনের একটা সম্ভ্রান্ত হোটেল এবং আমি যেহেতু অগ্রিম ভাড়া দিয়েছি, সুতরাং আ অ্যাম এনটাইটলড টু গেট আ লিটল প্রাইভেসি, স্পেশালি অ্যাট দিস আওয়ার।

প্রাইভেসি মানে মারামারির অধিকার নয়। তোমার চোখ ফোলা, মুখ দেখলেও মনে হয় না-খুব শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলে। দেখি ঘরে কে আছে? হেই! দেয়ার ইজ আ হোয়াইট গার্ল! ইউ বাস্টার্ড।

শাট আপ।

অ্যালিস দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, এসব কী হচ্ছে কী? আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছি। এখানে কোনো গন্ডগোল হয়নি। উই আর ফ্রেণ্ডস।

হোটেলের ম্যানেজার এ ক-দিন তপনের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহারই করেছে, আজ হঠাৎ নেশার ঘোরে কিংবা যেকোনো কারণেই হোক তপনকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে গেল। অ্যালিসকে তপনের ঘরে দেখে সে যেন খেপে গেছে। সরাসরি সে তপনকে নিগার বলে ফেলল। এইসব নিগার এসে সে লণ্ডন ছেয়ে ফেলছে এবং তারা ব্রিটিশ মেয়েদের নষ্ট করছে-সেকথা জানাতেও দেরি করল না। তপন আর কোনো কথা না বলে শক্ত হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে পুলিশটা তপনকে বলল, তৈরি হয়ে নাও, তোমাদের দুজনকেই একবার থানায় যেতে হবে।

তপন গম্ভীরভাবে বলল, আমি তৈরিই আছি। যদি থানায় যেতেই হয়, তাহলে আর দেরি করে লাভ কী? কিন্তু অফিসার, তোমার ওই ব্ল্যাবর মাউথ ম্যানেজারটাকে চুপ করতে বলো এবার।

.

০৮.

দমদমের আকাশে বিশাল জেটবিমানটা চক্রাকারে ঘুরছে। বৃষ্টি, দারুণ বৃষ্টি, পাইলট সম্ভবত এয়ারপোর্টের নির্দেশ ঠিক মতন পাচ্ছে না। জানলার কাঁচে জলকণার পাতলা পর্দা, তপন কিছুই দেখতে পেল না বাইরে তাকিয়ে-আকাশ-ফাটানো বৃষ্টির ধারায় বাইরের সব কিছুই অস্বচ্ছ। সাড়ে পাঁচ বছর বাদে তপন ফিরছে বাংলায়, কিন্তু আকাশ থেকেই বাংলাকে এক ঝলক দেখে নেবার সুযোগ পেল না।

সিটবেল্ট কোমরে বাঁধা হয়ে গেছে, সিগারেট নিবিয়ে ফেলার অনুরোধ ভেসে উঠেছে মাইক্রোফোনে, সবাই নামার জন্য প্রস্তুত, অনেকেই ব্যগ্রভাবে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে জানলা দিয়ে, বিমানটা তবু ঘুরছে। তপনের পাশের সিটে বসেছিল একজন জাপানি ভদ্রলোক, শুধু তার মুখখানাই দুশ্চিন্তাহীন নিরেট। তপনের একবার মনে হল, সে নিজের দেশকে অস্বীকার করেছে বলেই বোধ হয় তার দেশ তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না। তার জন্যেই এতগুলো যাত্রীর দুর্ভোগ, প্লেন এখানে ল্যাণ্ড করতে না পারলে হয়তো চলে যাবে হংকং কিংবা কাঠমাণ্ডু, আবার সেখান থেকে কলকাতায় ফেরা-কিংবা প্লেনটা এতদূর পথ নির্বিঘ্নে এসে এখানে এই বাংলার আকাশে ক্র্যাশ হলে কেমন হয়? টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে খসে পড়বে তপনের হাড়-পাঁজরা-ধুৎ, যতসব সেন্টিমেন্টাল চিন্তা, তপনও সেই জাপানি ভদ্রলোকটির দৃষ্টান্তে মুখে নিরুদ্বিগ্ন ভাব ফোঁটাবার চেষ্টা করল, জানলা থেকে চোখ সরিয়ে বসল হেলান দিয়ে।

সেই রাত্তিরে পুলিশের ঝঞ্ঝাটের জন্য তপনকে আরও দু-দিন থেকে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে। থানা থেকে অবশ্য সে-রাত্রেই ছাড়া পেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ রমণীর সঙ্গে অসমীচীন ব্যবহারের অভিযোগ টেকেনি। অ্যালিস বারবার দৃঢ় স্বরে বলেছে, তাকে কেউ প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে আনেনি, সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় গিয়েছিল হোটেলের ঘরে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে তারা কোনোরকম চেঁচামেচি বা গন্ডগোল করেনি–নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সময় গলার স্বর কখনো একটু উঁচু হয়ে যেতে পারে–কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি।

তপন নিজে থেকে কিছুই বলেনি অবশ্য, একরোখা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রথমে শুধু একবার বলেছিল, আমি একজন কালো লোক, সুতরাং আমি যা বলব–তা সবই তোমরা মিথ্যে বলে ধরে নেবে জানি,আমার যা বলার আমি কোর্টে গিয়ে বলব। তোমাদের যা খুশি করতে পার।

চিফ কনস্টেবল লোকটি ছিল রসিক, গল্পের দারোগার মতন তারও ছিল বেশ পুরুষ্টু পাকানো গোঁফ, তপনের কথা শুনে সামান্য হেসে বলেছিল, না, না, মিথ্যে কথা বলার অধিকার শুধু কালো লোকদেরই আছে–একথা আমি স্বীকার করতে চাই না, শ্বেতাঙ্গদেরও ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই মেয়েটির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

তপন বলেছিল, আমি এ সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না!

আপনি কি আজই একে রাস্তা থেকে পিক আপ করেছেন?

আই রিফিউজ টু আনসার

দারোগাটি ঠোঁট টিপে হেসে তপনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। উত্তেজনায় তপনের মুখখানা লাল। তপনের স্বভাবই এইরকম, যখন সে কোনো কারণে খুব অপমানিত বোধ

করে, তখন সে একেবারে মরীয়া হয়ে ওঠে, নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য কিংবা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যও কোনোরকম চেষ্টা করতে চায় না। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল তপন, চেয়ারে না বসে তার ওপর একটা পা তুলে দিয়েছিল। অ্যালিস তার পাশেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু তপন আর অ্যালিসের দিকে তাকাচ্ছে না একবারও।

দারোগাটি এবার অ্যালিসের দিকে ফিরল, নম্রভাবেই প্রশ্ন করল, মিস উডল্যাণ্ড, এই ভারতীয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

অ্যালিস বেশ স্পষ্টভাবেই মিথ্যে কথা বলল। একটুও দ্বিধা বা দেরি না করে বলল, অন্তত আঠাশ বছর ধরে, সেই ভারতবর্ষ থেকে।

ভারতবর্ষ থেকে? আই সি, আই সি।

তপন চমকে উঠে একবার অ্যালিসের দিকে না তাকিয়ে পারল না। অ্যালিস মুখখানা সোজা করে আছে, তবুও দেখলেই বোঝা যায়, অনেক যন্ত্রণা সে প্রাণপণে গোপন করে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে।

দারোগাটি আবার বলল, ভারতবর্ষ থেকে? ভারতবর্ষে কোথায়?

বাংলাদেশে, ঢাকা শহরে, আমার বাবা সেখানে পোস্টেড ছিলেন আমি সেখানে ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি ছেলেবেলায়।

তপন প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না, আবার অ্যালিসের দিকে তাকাল। ঢাকা শহরের কিছুই মনে নেই তপনের, অ্যালিসেরও মনে নেই–ওরা সেখানে একসঙ্গে খেলা করত? এই চরম মিথ্যেটাও একটা ছবি হয়ে ফুটে ওঠে, তপন এক পলকের জন্য দেখতে পায়–মাথায় সোনালি চুল ভরা একটি ফুটফুটে ফর্সা মেয়ের সঙ্গে তপনের পাঁচ বছরের শিশুমূর্তি খেলা করছে। ধুৎ যত সব বাজে, কোনো ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে কোনোদিন কোনো নেটিভদের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা করেনি।

দারোগাটি বলল, আমিও ঢাকায় ছিলাম কিছুদিন, বিটুইন নাইনটিন ফরটি-টু অ্যাণ্ড ফরটি ফোর–তখন যুদ্ধের সময়, আমি

তপনের মনে হল, দারোগাটি যখন ঢাকায় ছিল, তখন অ্যালিসের বাবার মৃত্যুর ঘটনাও নিশ্চয়ই জানে, লোকমুখে শুনেছে, এবার সেটা মনে পড়বে। অ্যালিস তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে আরও বিপদ ডেকে আনছে। তা হোক, লোকটি যদি কথায় কথায় সেই প্রশ্ন তোলে, তপন গোপন করবে না যে তার বাবাই অ্যালিসের বাবার হত্যাকারী। অ্যালিস এবার মুখ ফিরিয়েছে তপনের দিকে, চোখাচোখি হয়ে গেল দু-জনের, অ্যালিসের চোখে সনির্বন্ধ মিনতি।

দারোগাটি কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলই না, স্মৃতিমন্থনের সুরে বলল আমি জন্মেছিলাম বার্মায়। এমনই নেমেসিস, সেই বর্মা ফ্রন্টেই আমাকে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল, তোমাদের সেই বোস, সেই নেতাজি বোস, তার আর্মির সঙ্গে, কোহিমাতে আমি ধরা পড়েছিলাম, পি ও ডবলু হিসেবে ছিলাম আই এন এ ক্যাম্পে, তখন তোমাদের নেতাজিকে দেখেছিলাম, লোকটার রিয়েল গাটস ছিল–

দারোগাটি তারপর গল্প জুড়ে দিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার প্রতিবাদ করতেও কান দেয়নি, বরং ধমকে দিয়েছিল তাকে।

থানা থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছিল তপন আর অ্যালিস, নির্জন রাস্তায় কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি একসঙ্গে। তপন শেষপর্যন্ত বলেছিল, অনেক রাত হয়ে গেছে, অ্যালিস, তোমাকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব?

না, তার দরকার হবে না। থ্যাঙ্ক ইউ। আমি একাই যেতে পারব।

একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে পড়তে পড়তে অ্যালিস বলেছিল, গুড বাই তপন –। তখন তার কণ্ঠে একটুও অভিমান ছিল না।

–ফাসন ইয়োর সিট বেল্টস, প্লিজ–তপন আবার সচকিত হয়ে উঠল, প্লেন এবার সত্যি নামছে, বৃষ্টি তখনও পড়ছে অঝোর ধারায়, তবুও দমদমেই ল্যাণ্ড করবে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে গাছপালা ও বাড়ির রেখা, বহুকাল আগে দেখা কোনো দৃশ্যের স্মৃতির মতন। তপন আগে কোনোদিন দমদম এয়ারপোর্টে আসেনি, বাবার সময় তাকে মুম্বাই থেকে যেতে হয়েছিল। তাই মুম্বাই পর্যন্ত গিয়েছিল ট্রেনে। তবুও আকাশ থেকে দেখা দমদমের দৃশ্য তার মনে হল, যেন খুব চেনা, আগে সে অনেকবার দেখেছে, ওই পাশাপাশি তিন বৃদ্ধের মতন তিনটি তালগাছকে সে অনেকদিন থেকেই দেখছে দাঁড়িয়ে থাকতে। ঝাঁকুনি লাগতেই বুঝল, প্লেন মাটি ছুঁয়েছে এবার।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ই দেখা যায়, এই বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। কত লোকের কত প্রিয়জন ফিরছে বিদেশ থেকে, কত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার মিলন হবে, উৎসুক জনতা চেঁচিয়ে হাত নাড়ছে। তপনের জন্য কেউ ওখানে নেই, তার ফেরার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে নেই, তার উদ্দেশ্যে কেউ রুমাল নাড়বে না। তবুও তপন দূরের সেই ভিড়ের দিকে হাত নেড়ে দিল, যেন তার জন্যেও কেউ অপেক্ষা করে আছে ভিড়ের মধ্যে, ওরা তো আর অতদূর থেকে কারুকে চিনতে পারছে না।

কাস্টমস বেরিয়ারে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। তপনের কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, সে দু-তিনটে ক্যামেরা আনেনি; টেপরেকর্ডার কিংবা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো আনেনি, সে এখানে থাকতেও আসেনি। বিদেশি টুরিস্টদের মতন দু-এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে এসেছে। তপন এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে অন্যদের আগে সুযোগ করে দিল। ওপাশ থেকে কত চেঁচামেচি, কেউ ডাকছে, মন্টুদা, মন্টুদা। মেয়েলি গলায় সরু কলধ্বনি, জামাইবাবু, জামাইবাবু! ওভারকোটপরা একজন বাঙালি যুবক রয়েছে তপনের পাশে, তাঁর দু-কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলছে দু-তিনটে ক্যামেরা, বায়নোকুলার, জিনিসপত্রে ঠাসা সুটকেস-প্রচুর ডিউটি দিতে হবে ওকে। কোথায় গেল সেই জামাইবাবু। শ্যালিকাদের উদ্দেশ্যে খানিকটা গর্ব, খানিকটা লজ্জা

মেশানো ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। তপনকে একজনও চেনে না, কেউ ডাকল না তপন, তপন বলে।

বিমান কোম্পানির বাসই ধর্মতলার সিটি অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিত, কিন্তু তপন তাতে গেল না। একটা ট্যাক্সি নিল! ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন? তপন একটু চিন্তা করে বলল চলুন তো আগে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত।

কোথায় যাবে তপন জানে না। কলকাতায় তার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

কলেজে পড়ার সময় বরাবর থাকত মির্জাপুর স্ট্রিটের একটা মেসে। কলকাতায় আসবার খবর জানিয়ে সে কোনো বন্ধুবান্ধবকেও চিঠি লেখেনি, কারুকে খবরও দেয়নি। আজই ছোটোকাকার কাছে সিউড়িতে যাওয়া কি সম্ভব? ট্রেন-ফ্রেন কখন তা জানা নেই, তা ছাড়া কাকার মেয়ের বিয়ের দেরি আছে, এখনও দিন সাতেক, এই সাতদিন ধরে সে মফসসলে থাকতে চায় না।

ট্যাক্সি ছুটছে যশোর রোড ধরে, একটা সিগার ধরিয়ে তপন জানলা দিয়ে চেয়ে রইল। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার পরেই তপন একটা গন্ধ পাচ্ছে, যাকে বলা যায় টিপিক্যাল কলকাতা শহরের গন্ধ, পৃথিবীর আর কোনো শহরে এ-রকম গন্ধ নেই। রাস্তার পাশের খোলা ড্রেন থেকে ময়লা তুলে রাস্তার ওপরই জমা করে রাখা, মানুষজনে গিস গিস করছে, সব কিছুই যেন নোংরামির প্রতিমূর্তি। এত নোংরা আর আবর্জনার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে কী করে।

তপনের হঠাৎ একটু হাসি পেল। সত্যি সত্যি সে আমেরিকান টুরিস্টদের চোখেই দেখছে এই শহরকে। অথচ পাঁচ বছর আগেও সে এদেরই একজন হয়ে বেঁচে ছিল। জীবনের সেই ছাব্বিশ বছরের তুলনায় এই পাঁচ বছরের মূল্য কি বেশি? তপন এবার একটু অন্য চোখে তাকাল–পরিচিত দৃশ্য আবার দেখার মতন–তার মনে হল, শহরের চেহারা আর একটু জরাজীর্ণ হয়েছে, রাস্তা-ঘাটগুলো আগের চেয়েও খারাপ, সাধারণ মানুষের চেহারা আরও বেশি দুঃস্থ–ক্রমশ অবনতির দিকেই যাচ্ছে শহরটা।

এসপ্লানেডের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল এবার কোথায় যাব স্যার? তপন তখনও মনস্থির করতে পারেনি। একবার ভেবে নিল টালিগঞ্জে দিবাকরদের বাড়িতে যাবে, দিবাকরদের বিশাল বাড়িতে অনেক ঘর, ওর বউদিও তপনকে একসময় খুব ভালোবাসতেন –কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা মন থেকে বাতিল করে দিল। কারুর বাড়ি-টাড়িতে অযাচিতভাবে গিয়ে থাকা তার পোষাবে না। অন্য কোনো নতুন শহরে গেলে তপন এয়ারপোর্টে নেমেই টুরিস্ট গাইডের শরণাপন্ন হয়, বিশ্বাসযোগ্য হোটেলের লিস্ট চেয়ে নিয়ে মাঝারি দামের কোনো হোটেল বুক করে নেয় টেলিফোনে–কলকাতা শহরে এসেও সেই ব্যবস্থা করার কথা তপনের মনে পড়েনি।

একবার ভাবল, সরাসরি গ্র্যাণ্ড কিংবা গ্রেট ইস্টার্নেই উঠবে, কতই-বা খরচ–ওর তিনগুণ দামি হোটেলে খেয়েছে প্যারিসে। কিন্তু সেটাও সত্যি আমেরিকান টুরিস্টদের মতনই ব্যাপার হবে ভেবে, তপন একটা মাঝারি ধরনের হোটেলে উঠল।

মিউজিয়ামের পাশের রাস্তায় হোটেলটা। আপাত চাকচিক্য আছে, কিন্তু পরতে পরতে ময়লা লুকোনো। কাউন্টারের ম্যানেজারের ভাবভঙ্গিতে একটা চূড়ান্ত সাহেবিয়ানা রয়েছে, তবুও বোঝা যায় লোকটা অশিক্ষিত। এসব তপনের চোখ এড়ায় না কিছুতেই। বিশেষত ময়লা সিঁড়ি কিংবা নোংরা জানলার পর্দা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। দোতলায় তার ঘরের নম্বর দু-শো চোদ্দো। দু-শো বারো নম্বরের ঘরের পাশে ঘর, দু-শো তেরো নম্বরের কোনো ঘর নেই–বিলিতি কুসংস্কারটা পর্যন্ত বজায় রাখতে চেয়েছে এরা। নিজের ঘরে ঢুকে তপনের আবার মন খারাপ হয়ে গেল, মোটামুটি বড়োই ঘরটা, আলো-হাওয়া আছে কিন্তু আসবাবপত্রে একটা সস্তা চালিয়াতি। পাশের বাথরুমের কলে ছড়ছড় করে শব্দ হয়ে জল পড়ছে, নিশ্চয়ই কলটা ঠিক মতন বন্ধ হয় না। খাটের ওপর পরিষ্কার ধপধপে চাদর পাতা, তবু তপন চাদরটা তুলে তোশকটা দেখে নিশ্চিত হল। যা ভেবেছিল তাই, তোশকটায় অসংখ্য নোংরা দাগ। গা ঘিনঘিন করে এইসব বিছানায় শুতে। তপন বিরক্তি দমন করে মৃদু হাসল। মনে মনে বলল, খুব সাহেব হয়েছিস তপন তাই

না? বিদেশে যাবার আগে কলকাতার এইসব হোটেলে ঢুকে তোর তো চা খাবারও মুরোদ হত না। কিন্তু অভ্যাস বদলে গেছে তার আমি কী করব।

ভালোভাবে স্নান করে তখন ঘরেই খাবার আনিয়ে নিল, অনেকদিন বাদে ঝাল ঝাল পাঞ্জাবি রান্না মন্দ লাগে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে খাটে বসল। বাইরে গনগন করছে দুপুর। এখন বেরোবার কোনো মানে হয় না, তা ছাড়া বেরিয়ে যাবেই-বা কোথায়? বরং ঘুম লাগালেই ভালো। বহুকাল পরে আবার বাংলার মাটিতে ঘুম।

কিন্তু ঘুমটা তার তেমন স্বচ্ছন্দ হল না। ছোটো ছোটো অনেক স্বপ্ন ঝিলিক দিয়ে যেতে লাগল, তন্দ্রা ভেঙে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। তা ছাড়া কিছু একটা গোলমালেও বিরক্ত বোধ করছিল। কারা যেন জোরে জোরে কথা বলছে। কেউ যেন একবার তপন বলে ডেকে উঠল। আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসল ধড়মড় করে। কে ডাকছে তার নাম ধরে? কলকাতা শহরের কেউই তো জানে না, সে ফিরে এসেছে, উঠেছে এই হোটেলে! তপন কান পেতে রইল, আর কেউ ডাকল না। ভাবল, ঘুমের মধ্যে এ-রকম হয়, এ-রকম ডাক শোনা যায়। মানুষ বোধ হয় নিজেকেই নিজে ডাকে। সেও কি ঘুমের মধ্যে নিজেকেই ডেকে কিছু বলতে যাচ্ছিল? পাশের ঘরে কয়েকটি মেয়ের জোর গলায় কথা আর হাসাহাসির শব্দ আসছে। মেয়েগুলোর হাসির আওয়াজ কেমন যেন অসভ্য ধরনের। খিলখিল করে হেসে উঠেই আবার ফিসফিস করে কী যেন বলছে। একজন কে যেন বলল, এই মালতী! এই মুখপুড়ি? তপন খুবই বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু মুখপুড়ি শব্দটা শুনে আবার একটু মজা পেল। এই পাঁচ বছরে নানা দেশে অনেক বাঙালির সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। কিন্তু মুখপুড়ি কথাটা বাংলা ছাড়া আর কোথাও শোনা সম্ভব নয়। মেয়েদের মধ্যেই একজন আবার তপন, তপন বলে জোরে ডেকে উঠল। এবার সে নিশ্চিন্ত হল, তপন তা হলে অন্য কারুর নাম, হোটেলের কোনো বেয়ারাও হতে পারে কলকাতা শহরে তপন নামে গন্ডায় গন্ডায় লোক রয়েছে।

আর ঘুম হবে না। গেঞ্জি গায়েই তপন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। পাশের ঘরটার দিকে একবার তাকাল আড়চোখে। তিন-চারটি মেয়ে ও দু-জন পুরুষ বসে জটলা করছে সে-

ঘরে, সারি সারি সোডার বোতল সাজানো দেখে মনে হয়, ওখানে মদ্যপান চলছে। তপন একটু অবাক হল, দিনদুপুরে মেয়েরা বসে মদ খাচ্ছে, বাংলাটা কি ক-বছরে এত বদলে গেছে? কোনো ইংরেজ বা আমেরিকান মেয়েও তো এ-রকমভাবে দুপুর বেলা হোটেলে বসে মদ খায় না।

একটুবাদেই দু-টি মেয়ে বেরিয়ে পাশের ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়াল। তপনের দিকে তাকিয়ে তারা পরস্পর ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল হাসতে লাগল, হাসতে লাগল ঠোঁট টিপে। তপন অবাক হয়ে ওদের দেখছিল, একটি মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে এক চোখ বুজিয়ে তপনের দিকে কী যেন ইশারা করল। এতক্ষণে তপন বুঝতে পারল, মেয়েগুলো নষ্ট চরিত্রের, সম্ভবত বেশ্যা। তপন চোখ সরাল না, ওদের দিকেই তাকিয়ে রইল। মেয়ে দু-টি যেমন নির্লজ্জা তেমনি বেপরোয়া- সোজাসুজি ইঙ্গিত করছে এখন। মেয়ে দু টির স্বাস্থ্য মন্দ না, খুব টাইট ভাবে শাড়ি ব্লাউজ পরেছে, ব্লাউজটা মাছধরা জালের মতন ভেতরের কালো ব্রেসিয়ার স্পষ্ট দেখা যায়, পনিটেল-এর কায়দায় চুল বেঁধেছে। এতদূর থেকেও তপনের মনে হল, ওদের গায়ে নিশ্চয়ই শস্তা সেন্টের বিকট গন্ধ! নিশ্চয়ই ওদের ঘাড়ের কাছে ময়লা জমে থাকে! আগেকার দিন হলে, এতক্ষণ কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তপনের কান লাল হয়ে যেত লজ্জায়। এখন আর ওসব কিছু হয় না। নারী শরীর সে অনেক দেখেছে, সম্পূর্ণ নিরাবরণ শরীর, প্যারিসের স্ট্রিপটিজ ক্লাবের মেয়েরা শেষপর্যন্ত শুধু সেলোফিনের জাঙিয়া পরে থাকে।

শুধু শরীর সম্পর্কে তার আর লোভ নেই। এতদিন পর, বাংলার মেয়েরা তাকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানাল! পয়সার বিনিময়ে এক তাল মাংস! ঠিক ঘৃণায় নয়, খানিকটা বিস্ময়ভরা করুণার চোখে তপন ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একবার তার ইচ্ছে হল, বাঁদর নাচ দেখার পর যেমন ওপর থেকে ছুঁড়ে পয়সা দেয়, সেইরকম ওই মেয়ে দু-টোর দিকেও সে শ-খানেক টাকা ছুঁড়ে দেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর সেরকম কিছুই করল না, মেয়ে দুটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকাল।

হেমন্তের ক্ষণস্থায়ী বিকেল, রোদ্দুরের তেজ নেই, রাস্তায় অনেক মানুষ। এরপর তপন কোথায় যাবে? সাধারণ হোটেলে বসে থাকা তো সম্ভব নয়! কলকাতার রাস্তায় একা একা ঘুরবে? বন্ধুবান্ধব যারা ছিল একসময় তারা কোথায় সবাই ছড়িয়েছিটিয়ে গেছে, কোনো যোগাযোগ নেই। তপনই কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি! আজ কলকাতায় সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একজন কারুর নামও মনে পড়ল না, যার সঙ্গে সে এখন গিয়ে দেখা করতে পারে! আজ কী বার? তপন মনে করার চেষ্টা করল–কাল এই সময় রোমে ছিলাম, ভিয়া ভেনেত্তোয় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, মাথায় গুঁতো খেয়েছিলাম একটা দোকানের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে আজ আমি এই হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতার রাস্তা দেখছি–মাথায় এখনও রোমে সেই গুতো লাগবার ব্যথাটা রয়েছে। মনে পড়েছে, আজ শনিবার কেননা রোমে প্যান-অ্যাম বিমান কোম্পানি বলেনি, রবিবার তাদের কোনো ফ্লাইট নেই।

এই অঞ্চলটা দেখলে কলকাতা বলে ঠিক চেনা যায় না। রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন, বাড়িগুলো সুন্দর, মানুষজনের চেহারা ও পোশাক ঝকঝকে–এ জায়গাটার সঙ্গে লণ্ডনের কোনো একটা নির্জন রাস্তার কোনোই তফাৎ নেই। আকাশটা পরিষ্কার ঝকঝকে, লণ্ডনের আকাশ এ-রকম হয় না।

হঠাৎ তপনের একটা কথা মনে পড়ল। মিউজিয়ামের পাশের এই রাস্তাটার নাম সদর স্ট্রিট–ট্যাক্সি ড্রাইভার কিংবা হোটেলের ম্যানেজার অবশ্য বলল স্যাডার স্ট্রিট, কিন্তু তপন জানে। এই সেই সদর স্ট্রিট, এখানকারই কোনো একটা বাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথ নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি লিখেছিলেন না? এই সদর স্ট্রিটেরই এক বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনের সব আবরণ সরে গিয়েছিল, এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁর কাছে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমিও তো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি–আমার তো সেরকম কিছুই হল না, আমার চোখে পড়ল ক-টা নষ্ট মেয়ে আর এই ধূসর বিকেলে ব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি।

রেলিং-এর ওপর থুতনি রেখে তপন অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মধ্যেই একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল সেখানে। হঠাৎ তপন দেখল, তার চোখ দিয়ে জল

পড়ছে, দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে থুতনি পর্যন্ত। জীবনে তপন কখনো এত অবাক হয়নি। তার চোখে জল? কেন? হঠাৎ কীজন্য? একটুক্ষণ সে অন্যমনস্ক ছিল, তার মধ্যেই.. তপন বাঁ-হাতের উলটোপিঠ দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে গেল, কিন্তু মোছা হল না, নিজের অজান্তেই প্রায় তার বুক থেকে একটা ফোঁপানি উঠে এল, হু-হু করে কান্না এসে গেল আরও, তপন কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মতন জেদি, একরোখা ছেলে– সমস্তরকম দুর্বলতাকেই যে হেসে উড়িয়ে দিতে শিখেছে, কিন্তু হঠাৎ তারও মনে হল, এই পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা, তার কেউ নেই, তার জীবনটার কোনো মূল্য নেই, শুধু অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেঁচে থাকা। পৃথিবীর অনেক শহরের অনেক হোটেলেই সে একা একা কাটিয়েছে, কোথাও কোনোদিন সে এত বেশি নিঃসঙ্গতা বোধ করেনি, কোথাও এমন দুর্বল হয়ে পড়েনি। কিন্তু এই বাংলায় এসে, কলকাতা শহরের হোটেলে সে একা দাঁড়িয়ে আছে, এখানে কেউ তাকে চেনে না, কোথাও তার যাবার জায়গা নেই–এই কথা ভেবেই সে অনুভব করল যেন এক ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে তুলোর বীজের মতন উদ্দেশ্যহীনভাবে সে উড়ে বেড়াচ্ছে। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারল না তপন, সদর স্ট্রিটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধ না-মানা কান্নায় ডুবে গেল।

পাশের বারান্দার মেয়ে দুটি স্তম্ভিতভাবে চোখ গোল গোল করে তপনের দিকে চেয়েছিল। একটু পরে সেটা খেয়াল হতেই বিষম লজ্জা পেয়ে তপন ছুটে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

৯-১০. তপনের সঙ্গে কলকাতা শহরে

তপনের সঙ্গে কলকাতা শহরে প্রথম একজন চেনা লোকের দেখা হল সন্ধ্যে সাতটা আন্দাজ। তপন তখন মেট্রো সিনেমার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল, নাইট শো-র জন্য একটা টিকিট কাটবে কিনা সেকথাই ভাবছিল সত্যি সত্যি। তার তো আর কিছুই করার নেই। একবেলাতেই সে কলকাতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কলকাতায় তার কলেজজীবনের বন্ধুবান্ধব এখনও কয়েকজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে দেখা করার কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না।

তবু, একজনের বাড়িতে গিয়েছিল অবশ্য বিকেল বেলা-মির্জাপুর স্ট্রিটে তার বন্ধু দীপেন থাকত-ছাত্র বয়সে দীপেন তাকে কিছু সাহায্য করেছে। মীর্জাপুর স্ট্রিটের নাম বদলে সূর্য সেন স্ট্রিট হয়ে গেছে, রাস্তাটার কোনোই বদল হয়নি এই ক-বছরে, দীপেনদের বাড়িটাও সেরকমই আছে। কিন্তু দীপেনরা আর সেখানে থাকে না। দরজায় কড়া নাড়তেই একজন অপরিচিতা মহিলা খুলে দিলেন, ভুরু কুঁচকে বললেন, দীপেন দাশগুপ্ত? জানি না তো। তপনের বাড়ি ভুল হয়নি-এ বাড়িতে সে দীপেনের সঙ্গে বহুবার এসেছে, তবু সেই মহিলা বললেন, ও নাম তিনি শোনেননি, হতে পারে, আগের ভাড়াটেদের কেউ ছিল হয়তো-কিন্তু তারা এখন কোথায় থাকে, সে-সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে কথা বলছিলেন, যেন তপন কোনো অন্যায় করেছে-তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে চলে এল- ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে ওরকম অভদ্র ব্যবহার করলেন কেন? সে কি কোনো দোষ করেছে? তপন তো জানতই না, দীপেনরা ভাড়া বাড়িতে থাকে-দীপেনের ব্যবহারে বেশ খানিকটা চালিয়াতি ছিল। একটু ভাবতেই তপন বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা শুধু বিশেষ করে তার সঙ্গেই ওরকম ব্যবহার করেননি-অপরিচিত পুরুষ দেখলেই বাঙালি মেয়েরা ওইরকম আড়ষ্ট ও কর্কশ মুখ করে কথা বলে- যেন, সব পুরুষই নরখাদক। একথা তো তপন জানতই!

এরপরে আর কোনো বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার উৎসাহ পায়নি, এসপ্ল্যানেড পাড়ায় বিদেশি টুরিস্টদের মতন ঘুরছিল সেখানে ড. চ্যাটার্জিই প্রথম তপনকে দেখতে পেলেন। অন্যমনস্ক তপনের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বললেন, আরে, তপন না? কেমন আছ? কী করছ এখন?

বি এসসি ক্লাস পর্যন্ত তপন ড. চ্যাটার্জির ছাত্র ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। খুব ভালোবাসতেন তপনকে। একজন অধ্যাপকের পক্ষে যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, ড. চ্যাটার্জি নিজেই মাঝে মাঝে আসতেন তপনের সঙ্গে ওর মেসে দেখা করতে। তপনকে বলতেন, তোমার মধ্যে বিজ্ঞান শেখার এমন একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, যা আজকাল অনেক ছাত্রর মধ্যেই দেখা যায় না। সবাই তো মুখস্থ করে। আমারও তাই, বুঝলে তপন, আমিও মুখস্থ করেই পাস করেছি।

হাতে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, পাঞ্জাবিটা সামান্য ময়লা-আগে ড. চ্যাটার্জির পাঞ্জাবি সবসময় ধপধপে ফর্সা থাকত, চশমার লেন্স আর একটু পুরু হয়েছে। ড. চ্যাটার্জিকে দেখে তপন সত্যিই খুব খুশি হয়ে উঠল। আগে ও কখনো অধ্যাপকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেনি, আজ সামান্য ইতস্তত করে ঝুপ করে পায়ে হাত ছুঁইয়ে দিল। হাসিমুখে বলল, স্যার, আপনি ভালো আছেন?

এই, কোনোরকম। তুমি এখন কোথায় চাকরি করছ?

চাকরি কোথাও করছি না। রিসার্চ করছি বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে।

রিসার্চ করছ! চাকরি পাওনি বুঝি? চাকরির বাজার বড়ো খারাপ। কোথায় রিসার্চ করছ? যাদবপুরে?

না, স্যার, বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে।

কোথায়? বার্কলে মানে? ও, আমেরিকায়-তা ফিরে এলে কেন? অ্যাঁ?

ফিরে ঠিক আসিনি, কয়েকদিনের জন্য

না, না, ওসব করতে যেও না, আজকাল আবার পাসপোর্ট ভিসার যা হাঙ্গামা–মাসে মাসে নিয়ম পালটাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও–এখানে আর মরতে এসো না।

ড. চ্যাটার্জি কথা বলতে বলতে বেশ দ্রুত হাঁটছিলেন, তপন পাশে পাশে পা মিলিয়ে চলছিল। ড. চ্যাটার্জি তপনের রিসার্চ বিষয়ে কোনো আগ্রহই দেখালেন না, চাকরি-বাকরি নিয়েই কথা বলতে লাগলেন, তাঁর এক ভাগ্নে এম এসসি পাস করে বেকার বসে আছে–শেষপর্যন্ত হয়তো স্কুল মাস্টারিতেই ঢোকাতে হবে, একবার যদি স্কুল মাস্টারিতে ঢোকে তা হলে কী আর-তপন কি ওর জন্যে আমেরিকায় কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

তপন একথার কী উত্তর দেবে ভাবছিল, ড. চ্যাটার্জি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওসব বাতিক যেন মাথায় ঢুকিয়ো না, দেশে ফেরা-টেরার বাতিক–যতদিন পার বিদেশেই থাকবে। কী হবে এখানে ফিরে কোনো চাকরি পাবে না। সায়েন্টিফিক পুল-এ সাড়ে চার শো টাকা করে বেকারভাতা পেতে পার, কিন্তু বছরের পর বছর বসে থেকে থেকে বিজ্ঞান সব কিছু ভুলে, শিখবে শুধু তাশ-পাশা খেলা! খবরদার যেন আমার মতন মাস্টারির লাইনেও ঢুকো না। জীবনটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

স্যার, আপনিও তো ইচ্ছে করলেই বিদেশে যেতে পারতেন! আপনি কেন যাননি?

যাবার কি ইচ্ছে ছিল না? খুব ছিল। সম্ভব নয় আমার পক্ষে, বাড়িতে সবসুদ্ধ আট ন-জন লোক, আমার দিদি বিধবা হয়ে আমার কাছেই এসেছেন–তাঁর তিনটে ছেলে-মেয়ে, ফেলতে তো পারি না।

স্যার, আপনি কেমিক্যাল রি-অ্যাকশানস-এর কজ অ্যাণ্ড এফেক্ট নিয়ে যে কিছু কাজ করছিলেন, সে-সম্পর্কে কোনো পেপার বার করেছেন?

দূর, দূর, ওসব কাজটাজ গোল্লায় গেছে কবে! এখন ছাত্রদের শুধু নোট মুখস্থ করাই! আচ্ছা, টু-বি বাস এখন একটু ফাঁকা পাওয়া যেতে পারে, তাই না?

ড. চ্যাটার্জি এত দ্রুত প্রসঙ্গ পালটালেন যে, তপন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে বলল, টু-বি বাস? তারপর হেসে বলল, স্যার, আমি সাড়ে পাঁচ বছর বাদে আজই এদেশে ফিরেছি-কলকাতায় ট্রাম-বাসের অবস্থা এখন কীরকম ঠিক জানি না।

তপন মনে মনে প্রত্যাশা করেছিল, এতদিন পরে সে আজই প্রথম কলকাতায় এসেছে শুনে ড. চ্যাটার্জি খানিকটা বিস্মিত হবেন, তার সঙ্গে অনেক কথা বলতে চাইবেন। কিন্তু, ও দেখল, এতদিন পর ফেরাটা শুধু ওর নিজের কাছেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আর কারুর কাছে কিছু না। ড. চ্যাটার্জি ও সম্পর্কে কোনো ক্ষেপই করলেন না, আপন মনে বললেন, আমার টিউশনি আছে, যেতে হবে কসবায়-ট্রামে, বাসে যা ভিড়।

তপন তবু বলল, স্যার, একটু কোথাও বসে চা খাবেন? অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল।

চা তো আমি খাই না, গ্যাসট্রিক আলসার হবার পর থেকে।

আপনার আলসার হয়েছে?

ড. চ্যাটার্জি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাসীনভাবে বললেন, একটা কথা কি জানো তপন, আমি খাই শুধু সেদ্ধ ভাতে-ভাত, সামান্য একটু দুধ, আমি যা খাই পরি-তাতে আমার নিজের জন্য মাসে শ-খানেক টাকার বেশি খরচ হয় না-তবু সংসার চালাবার জন্য আমাকে মাসে বারো-তেরো-শো টাকা রোজগারের জন্য মুখের রক্ত তুলে খাটতে হচ্ছে-আমার নিজের সব শখ, ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে এজন্য। এরকমভাবে বেঁচে থাকার মানে কী বলতে পার? এখন আমার আর বিজ্ঞান পড়তে ইচ্ছে করে না, একটু সময়-টময় পেলে দর্শনের বই-টই পড়ে শান্তি পাবার চেষ্টা করি।

তপন অনেক কিছু বলতে পারত, কিন্তু চুপ করে রইল। ড. চ্যাটার্জি আবার বললেন, আমরা এই ভাবেই নষ্ট হয়ে যাব, তোমাদের বয়স কম, তোমরা যদি কিছু করতে পার।

স্যার, আমার বয়স আপনার থেকে খুব বেশি কম নয়। আমি হয়তো আপনার থেকে বছর দশেকের ছোটো হব।

তা হলে, তোমারও উদ্দেশ্যহীন ভাবেই জীবনটা নষ্ট করে যাবে। তোমাদের পরের ছেলেরা যদি কিছু পারে! তপন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলি বুঝলে–।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই ড. চ্যাটার্জি একটা চলন্ত টু-বি বাসে উঠে পড়লেন। ভেতরে ঢুকতে পারলেন না, ঝুলতে লাগলেন ফুটবোর্ডের হাতল ধরে। তপনের হঠাৎ মনে হল, ড. চ্যাটার্জি নিশ্চয়ই আজকাল ক্লাসে ফাঁকি দেন, আগেকার মতন আর মন দিয়ে পড়ান না, ওঁর মুখে চোখে একটা ক্লান্তির ছাপ গাঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে।

ড. চ্যাটার্জি তপনকে আর দু-টি কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গ্যাসট্রিক আলসার–তপনেরও গ্যাসট্রিক আলসারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে আর ব্যথা হয়নি–তপন অবশ্য খাওয়া সম্পর্কে এখনও বাছবিচার করে না। আর টিউশনি–তপনও একসময় টিউশনি করত। কলেজ জীবনটায় টিউশনি করেই নিজের খরচ চালিয়েছে– স্কলারশিপের সামান্য ক-টা টাকায় কিছুই হত না–ড. চ্যাটার্জিও ওকে দু-একটা টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে একটি ছেলে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, সুবীর গুপ্ত, সদানন্দ রোডে বাড়ি–ছেলেটা খুব ভালোবাসত তপনকে–বিদেশেও প্রথম দু বছর অনেক চিঠি লিখেছে। সুবীরের দিদি দময়ন্তী, বড়ো অহংকার ছিল মেয়েটির কোনো কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে অহংকার খুব মানায়, দময়ন্তীকে মানাত।

সুবীরদের বাড়িতে গেলে কেমন হয়? ওদের নিজস্ব বাড়ি সদানন্দ রোডে–তপন সেটা খুব ভালোভাবে জানে, ওদের অন্য কোনো জায়গায় উঠে যাবার সম্ভাবনা নেই। তপনকে দেখলে সুবীর নিশ্চয়ই খুশি হবে। তপন একসময় সুবীরের চোখে হিরো ছিল। দময়ন্তীও কি এখনও ওবাড়িতে থাকে? দময়ন্তীরও বিদেশে যাবার কথা। একটা খালি ট্যাক্সি দেখে তপন হাত তুলে ডাকল।

ট্যাক্সিটা গতি কমিয়ে তপনের থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াল। তপন একটু দ্রুত হেঁটে এসে ট্যাক্সিটাতে উঠতে যেতেই একজোড়া সাহেব-মেম ট্যাক্সির হাতল ধরে দাঁড়াল। তপন খানিকটা অবাক হয়ে বলল– এক্সকিউজ মি, আমি এটা আগে ডেকেছি।

সাহেবটি বলল, আই ডোন্ট থিংক সো, সরি–।

উচ্চারণ শুনেই তপন বুঝতে পারল, ওরা ব্রিটিশ। কিন্তু নিশ্চয়ই অনেকদিন এদেশে আছে, কোট-প্যান্টের কাট একেবারে বাঙালের মতন, লণ্ডনের রাস্তায় ওইরকম পোশাক পরে ঘুরলে লোকে হাসবে। এদেশে থেকে থেকে কি সাধারণ সভ্যতা-ভদ্রতাও ভুলে গেছে? তপন স্পষ্ট জানে, সে হাত তুলে ডাকার পরই ট্যাক্সি ড্রাইভার তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে, তারপর গাড়ির গতি কমিয়েছে। ড্রাইভারটা কিন্তু এখন বলল, নেহি, সাহাব আগাড়ি বোলায়া, আপ ছোড় দিজিয়ে।

ঝট করে তপনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এখনও সাদা চামড়ার প্রতি ভক্তি! আমেরিকাতেও তাকে কোনোদিন সাদাকালোর সমস্যায় পড়তে হয়নি, আর এই কলকাতা শহরে। মেমসাহেবটি ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকতে যেতেই তপন দৃঢ় হাতে গাড়ির দরজা চেপে ধরল।

অন্য সময় হলে, স্বাভাবিক ভদ্রতায় তপন ওদেরই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিত-মহিলাকে অগ্রাধিকার দেবার স্বাভাবিক সহবৎ জ্ঞান ওর আছে। কিন্তু রাগের মুহূর্তে তপন সব কিছু ভুলে যায়। বিশেষত, সাহেব-মেমটির মুখের ভাব এমন যে, তারা যেন তপনকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করছে না, তারা জানেই, ট্যাক্সি ড্রাইভার তপনকে নেবে না, তাদেরই নেবে– এতেই তপনের রাগ হল বেশি।

তপন ড্রাইভারকে ধমকে বলল, কাহে ঝুট বোলতা?

নেহি সাহেব, মেমসাহেব হাত দেখায়। আপ ছোড় দিজিয়ে না–

আবার মিথ্যে কথা

সাহেবটি তপনের কাঁধে হাত রাখার ভঙ্গি করল, হাত ছোঁয়ালো না, বলল, লিসন,–।

তপন বলল, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

মেমটি তিক্ত গলায় বলল, উই শুড নট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম।

সাহেবটি জোর করে দরজা খোলার চেষ্টা করতেই, তপন গোঁয়ারের মতন প্রায় ঠেলেই নিজে উঠে পড়ল। জানলা দিয়ে বলল, তোমরা যদি জোর না করে অনুরোধ করতে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ছেড়ে দিতাম।

সাহেবটি তপনকে কিছু না বলে মেমের দিকে তাকিয়ে বলল, ইউ নো দেম! মেমটি তপনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কোনো অসভ্য বর্বর বন-মানুষকে দেখছে। একটা ঘৃণার ভঙ্গি করে ওরা দু-জনে সরে গেল। তপনের একবার ইচ্ছে হল, ওদের বাপ-মা তুলে গালাগাল দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে গম্ভীরভাবে ড্রাইভারকে বলল, চলিয়ে কালিঘাট।

ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল না, কর্কশ গলায় জানাল, নেহি জায়েগা!

তপনের মাথায় আগুন জ্বলছে। পৃথিবীতে আর সব কিছু ভুলে এখন এই ট্যাক্সিতে কালিঘাট যাওয়াই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এদেশে এখনও সাদা চামড়াদের কাছে নিজেদের এত হীনমন্যতা! এই ট্যাক্সি ড্রাইভার কেন তার বদলে ওদের নিতে চাইছিল, বকশিশের আশায়? ওই সব ফোতো কাপ্তেন সাহেবরা ক-পয়সা বকশিশ দেয়, তা তপনের খুব জানা আছে! উত্তেজনা যতদূর সম্ভব দমন করে তপন শান্তভাবে বলার চেষ্টা করল, শোনো সর্দারজি, তুমি কেন এ-রকম ব্যবহার করছ? তুমি ট্যাক্সি চালাচ্ছ যে তোমাকে আগে ডেকেছে

বোলতা হ্যায় তো কালিঘাট নেহি জায়েগা! উতার যাইয়ে।

তুমি যাবে না, তোমার ঘাড় যাবে।

লোকটি তার দাড়িওয়ালা মুখখানা সম্পূর্ণ তপনের দিকে ফিরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, কাহে আপ ঝামেলা করতা; উতার যাইয়ে গাড়ি সে।

-না, যাব না! দেখি তুমি কি কর, পুলিশ আসুক। তপনের শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা সতর্ক হয়ে উঠেছে। দরকার হলে সে মারামারি করবে। ওই বিশাল চেহারার লোকটার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে সে যদি মরেও যায়, তাতেও ক্ষতি নেই, সে মরে গেলে পৃথিবীতে কারুর কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে এ গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

প্রায় এক মিনিট ট্যাক্সি ড্রাইভারটি তপনের চোখের দিকে চেয়ে রইল। তপনও চোখ সরাল না, কটমট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তপনের হাত দু-খানা তৈরি হয়ে আছে, সর্দারজির কোমরে ছুরি ঝুলছে, যদি ছুরি বার করার চেষ্টা করে, তা হলে তার আগেই তপন ওর টুটি চেপে ধরবে।

লোকটি তপনের দিকে চেয়ে থেকে কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে গজগজ করতে করতে গাড়িতে স্টার্ট দিল। তপন সিটে হেলান দিয়ে রাজা-বাদশার মেজাজে হুকুম করল চৌরঙ্গি দিয়ে সোজা চলো-

আশ্চর্য, ওই ব্রিটিশ দম্পতি ইংল্যাণ্ডে থাকলে কিছুতেই এ-রকম অভদ্র ব্যবহার করতে পারত না। সেখানে যদি ওরা ভুল করেও, মনে করত যে, ওরাই আগে ট্যাক্সি ডেকেছে, তাহলেও আরেকজন এসে দাবি জানালেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিত এবং সেই আরেকজনও ওদেরই শেষপর্যন্ত যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। এখানে ওরা তপনকে সে ভদ্রতা দেখাবার সুযোগই দিল না। নিজেদের দেশে ওরা ভদ্র, আর বাইরে এসে এ-রকম অভদ্র, নীচ হয় কী করে? ভারতবর্ষে ইংরেজরা যতরকম নীচতা করেছে, ইংল্যাণ্ডের বহু লোক তা বিশ্বাসই করতে পারবে না। ইংল্যাণ্ডে তো টেডের মতন হৃদয়বান ছেলেও আছে,

কিংবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সেই বুড়ো লোকটি, অথবা দিবাকরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পুলিশ কনস্টেবল

হঠাৎ অ্যালিসের মুখখানা মনে পড়ল তপনের। তার রাগী মস্তিস্কে অ্যালিসের মুখখানা এখন আরও রাগ বাড়িয়ে দিল না, বরং তপনের সমস্ত স্নায়ুগুলো নরম হয়ে এল, এক ধরনের মমতায় ভরে গেল মনটা। কেন অ্যালিস অত অপমান সহ্য করেছে তার কাছে? অ্যালিস বলেছিল, তাকে ভালোবাসে। সত্যিই কি এর নাম ভালোবাসা? তপনকে এমনভাবে ভালোবাসার কথা আর কেউ কখনো বলেনি। যদি এর নামই ভালোবাসা হয়, তাহলেও আমার কোনো দোষ নেই। অ্যালিস কেন ভুল লোককে ভালোবাসতে গেল!

তপন অ্যালিসের কথা ভাবতে ভাবতে খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাই সুবীরদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমেও লক্ষ করেনি যে, সুবীরদের বাড়ির সামনে দু-তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন আনাগোনা করছে দ্রুতভাবে। যে-বৈঠকখানায় বসে তপন সুবীরকে পড়াত, সে-ঘরে চার-পাঁচজন নারী-পুরুষ নিজেদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা করছেন নিবিষ্টভাবে। তপন সেখানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, সুবীর আছে নাকি?

ওঁরা আলোচনা থামিয়ে সবাই চুপ করে গেলেন এক সঙ্গে। তারপর একজন মহিলা বললেন, হ্যাঁ, আছে, এক্ষুনি নামবে নীচে, আচ্ছা আমি খবর পাঠাচ্ছি। আপনি বসুন, তপনবাবু।

তপন এবার চিনতে পারল, মহিলাটি সুবীরের কাকিমা। প্রায় পাঁচ বছর এ বাড়িতে মাস্টারি করেছে তপন, সুতরাং এ পরিবারের প্রায় সবারই সঙ্গে তার চেনা ছিল। সুবীরের কাকাও ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও খানিকটা নীরস গলায় বললেন, বসুন মাস্টারমশাই, অনেক দিন আসেননি এদিকে–।

তারপর তপনের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাশের এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে মৃদু গলায় কি যেন বলতে লাগলেন। তপন একটু আহত বোধ করল। চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলেই সে আশা করে, সে যে এতদিন পর হঠাৎ কারুকে না জানিয়ে কলকাতায় ফিরেছে

এতে সবাই অবাক হয়ে যাবে, তাকে নিয়ে সবাই আলোচনা শুরু করবে! ড. চ্যাটার্জিকে দেখেই একথা মনে হয়েছিল। এতদিন পরে ফিরে তার অনেক কিছুই নতুন লাগছে, চোখের ঘোর এখনও কাটেনি মাত্র গতকালই সে ছিল রোমে, তার দু-দিন আগে লণ্ডনে। কিন্তু কলকাতায় যারা রয়েছে, তারা সবাই নিজেদের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। তপন যে বিদেশে গিয়েছিল, সে-কথাই তো সুবীরের কাকার মনে পড়ল না। আগে তপন সুবীরের বাড়ির গুরুজনদের সামনে সিগারেট খেত না, কিন্তু আজ ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। এখনও তার পকেটে রোম থেকে কেনা সিগারেটের প্যাকেট।

একটুক্ষণের মধ্যেই সুবীর এল, বাইরে যাবার পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে। তপনকে দেখে এক পলকের জন্য তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, উৎফুল্ল গলায় বলল, তপনদা! কবে এলেন? পরক্ষণেই সুবীরের মুখ আবার বিমর্ষ হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বলল, আপনি এখন কলকাতাতেই থাকবেন তো? আপনার ঠিকানা কী? আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে।

তপন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, সুবীর তুমি কোথায় যাবে?

নার্সিং হোমে।

কার অসুখ?

দিদির, মানে পরশুদিন দিদির একটি ছেলে হয়েছে, সিজারিয়ান করতে হয়েছিল, এমনি কোনো গন্ডগোল ছিল না, কিন্তু আজ থেকে হঠাৎ খারাপ দিকে টার্ন নিয়েছে, বাচ্চা আর দিদি দু-জনেরই ক্রাইসিস এখনও কাটেনি, আমরা একটু আগে নার্সিং হোম থেকে ফিরেছি

- হঠাৎ আবার টেলিফোন।

এরপর তপন যেটা বলল, এক মুহূর্ত আগেও সে নিজেই-ভাবেনি যে সে একথা বলবে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে নার্সিং হোমে যাই।

আপনি যাবেন? আপনার কোনো কাজ নেই?

না।

চলুন, তাহলে বেরিয়ে পড়ি।

সুবীরের কাকা-কাকিমা এবং আরও দু-জন লোক গাড়িতে উঠলেন। সুবীর বসল স্টিয়ারিং এ। তপন একটু সংকুচিতভাবে বলল, তাহলে যাক বরং, আমি আর-গাড়িতে জায়গা হবে না-।

সুবীর বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে! আপনি আমার পাশে বসুন, বেশি দূর তো নয়।

যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সেই তপনকে এড়িয়ে ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে, এটা আর তপন সইতে পারছিল না। কলকাতায় একাকীত্ব তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে চাইছিল চেনাশুনো কারুর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। নইলে সম্পূর্ণ বাইরের লোক হয়েও ওদের সঙ্গে তার এখন নার্সিং হোমে যাওয়া হয়তো ঠিক মানায় না।

দময়ন্তীর মুখখানা মনে পড়ল তার। দময়ন্তীর কবে বিয়ে হয়েছে, সে খবরও তপন রাখে না। শেষ যেদিন দময়ন্তীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেদিন দময়ন্তী বড়ো নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তার সঙ্গে। সায়েন্স কলেজে রি-ইউনিয়ান ছিল সেদিন, দময়ন্তী হাসতে হাসতে তাকে বলেছিল-। থাক, তপন সেসব কথা এখন মনে করতে চায় না। দময়ন্তী এখন হাসপাতালের খাটে মুমূর্ষু হয়ে শুয়ে আছে।

দময়ন্তীরও একদিন বিয়ে হবে, সন্তান হবে,-এসব যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। পোয়াতি অবস্থায় কীরকম চেহারা হয়েছিল দময়ন্তীর? তপন ভাবতেই পারছে না। এক ধরনের মেয়ে আছে, যাদের সম্পর্কে কল্পনাই করা যায় না যে, কোনোদিন তাদের অসুখ হবে কিংবা রূপ ঝরে যাবে। মনে হয়, দেবীর মতনই তাদের রূপ ও আয়ু অবিনশ্বর। দময়ন্তীকে দেখে তপনের এই রকম মনে হত! উঠতি যৌবন বয়সের পাগলামি! এখন

তপন যদি দেখে দময়ন্তী ফুটবলের মতন গোল আর মোটা হয়েছে, তাহলেও আশ্চর্য হবে না। পৃথিবীর নিয়মই তো এই, সবাই বদলাবে, বদলাতে হবেই, এ-নিয়ম ক্ষমা করে না কারুকে।

নার্সিং হোমে পৌঁছেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। বাচ্চাটা একটু আগেই মারা গেছে। দময়ন্তীর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। বাচ্চাটির মৃত্যুসংবাদে কেউ একটুও বিচলিত হল না, কেউ কাঁদল না, সুবীরের আত্মীয়স্বজনরা পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করে চুপ করে রইল। একটা প্রাণ জননীর গর্ভের অন্ধকারে দু-শো-সত্তর আশি দিন ধরে একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠেছিল, মায়ের শরীর থেকে রস আর জীবন নিঙড়ে নিয়েছে, তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে শুধু কেঁদেছে ক-বার, দু-দিন শুয়ে ছিল অক্সিজেন টেন্টে, বোধ ছিল না, চেতনা ছিল না। তার মৃত্যুতে আর কে শোক করবে! এখন সবার চিন্তা, ওই হতভাগ্য শিশু তার জননীকেও না খায়।

দো-তলার কোণের ঘরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে দময়ন্তী, ওরা সবাই এক-তলায় অপেক্ষা করছে। কেউই প্রায় কোনো কথা বলছে না। এতটা থমথমে ভাব তপনের ভালো লাগে না। দময়ন্তীকে বাঁচাবার যা-কিছু চেষ্টা করবেন ডাক্তাররাই, প্রায় শুধু শুধু মুখ ভার করে থেকে তো কোনো উপকার করতে পারবে না। বরং স্বাভাবিক ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করাই তো ভালো। দময়ন্তী মারা যাবে-একথা তপন যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। না, না, তা হয় না, ওটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। ইচ্ছাশক্তির যদি কোনো মূল্য থাকে তবে তপন তার প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়েই দময়ন্তীকেই বাঁচিয়ে তুলতে পারে। বারবার মনে পড়ছে, দময়ন্তীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ। বিভিন্ন পটভূমিতে দময়ন্তীর মুখখানা দেখতে দেখতে তপনের বুকটা টনটন করে উঠল। অন্তত দু-তিন বছর দময়ন্তীর কথা তার একবারও মনে পড়েনি, অথচ, আজ মনে হচ্ছে, দময়ন্তীর মৃত্যুসংবাদ শুনলে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

তপন সুবীরকে জিজ্ঞেস করল, দময়ন্তীর স্বামী, মানে তোমার জামাইবাবুকে দেখছি না তো! তিনি–

অরুণদা তো কালই দিল্লি ফিরে গেছেন। একদম ছুটি পান না, পরশুদিন সেফ ডেলিভারির খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন–আজ আবার টেলিগ্রাম করা হয়েছে অবশ্য।

তোমার অরুণদা দিল্লিতে কী কাজ করেন?

উনি তো ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।

কবে বিয়ে হয়েছে?

এই জুলাইতে তিন বছর হল।

এরপর তপনের মনে যে প্রশ্নটা এল, সেটা ও উচ্চারণ করল না। দময়ন্তী নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে, নাকি বাড়ির ব্যবস্থা করা বিয়ে? পাঁচ-ছ বছর আগে অরুণ নামে কোনো ছেলের সঙ্গে দময়ন্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না। প্রশান্ত দেববর্মন নামে একটি ছেলে বরং দময়ন্তীর কাছাকাছি খুব ঘুর ঘুর করত।-বাড়ির কথামতো কারুকে বিয়ে করবে দময়ন্তীর মতন মেয়ে, তাও বিশ্বাস হয় না! কিন্তু এখন এই প্রশ্ন করা যায় না।

তপনের সঙ্গে দময়ন্তীর যে-সম্পর্ক ছিল, তাকে ঠিক প্রেম বলা যায় না। ছাত্রীর দিদির সঙ্গে প্রেম করার কোনো মতলবই তপনের কোনোদিন ছিল না। সুবীরকে পড়াবার সময় দময়ন্তী মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকতে দুটো-একটা কথা বলত, কিন্তু বসে গল্প করেনি কখনো। কিন্তু দময়ন্তীর সঙ্গে প্রায়ই বাইরে দেখা হয়ে যেত। দময়ন্তী পড়ত সাইকোলজি, তপনের সঙ্গে সায়েন্স কলেজে ক্যান্টিনে দেখা হত, তপন নিজে থেকে কোনোদিনই দময়ন্তীকে ডাকেনি, দময়ন্তীই তার বান্ধবীদের ছেড়ে উঠে এসেছে তপনের কাছে। অন্যান্য মেয়েদের মতন দময়ন্তীর ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা ছিল না, এক- এক দিন সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে দময়ন্তী বলত, আপনি ছবি দেখতে ভালোবাসেন? চলুন, চৌরঙ্গিতে একটা আর্ট এক্সিবিশান হচ্ছে, দেখে আসি! বাড়ি থেকে গাড়ি আসত দময়ন্তীর জন্য, গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে তপনের সঙ্গে সে রাস্তায় হাঁটত। দময়ন্তীর সমস্ত অস্তিত্বে কাচের মতন একটা কী

যেন সূক্ষ্ম ব্যাপার ছিল, হাত দিয়ে ছুঁলেই যেন ভেঙে যাবে। তপন কোনোদিনই ছোঁয়ার চেষ্টাও করেনি। একদিন আউটরাম ঘাটে জলের ধারে অন্ধকারে ওর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক ধরে গল্প করেছিল, সেদিনও না।

ওরকম এক-এক দিন দেখা হবার পরও কিন্তু দময়ন্তী বলত না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা তপন তার পরদিনও সায়েন্স কলেজে আসবে কি না। চলুন পরশুদিন অমুক জায়গায় যাব, এ ধরনের কথা দময়ন্তী কোনোদিন উচ্চারণ করেনি, হঠাৎ দেখা হলেই তার যা-কিছু মনে পড়ত-তখন সে অবলীলাক্রমে বন্ধু বান্ধবীদের ছেড়ে তপনের সঙ্গে চলে আসত। তপনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কোনো প্রশ্ন করেনি কোনোদিন। তপনও নিজে থেকে কোনোদিন বলেনি, কোনোদিন ডাকেনি।

একবার শুধু ডেকেছিল। রি-ইউনিয়নের দিন দময়ন্তীর গান শেষ হবার পর তপন ওকে আলাদা ডেকে বলেছিল, আমার এ জায়গায়টায় থাকতে আর ভালো লাগছে না। চলো, আমরা অন্য কোথাও যাই। দময়ন্তী একটু অবাক হয়ে বলেছিল, কোথায়? তপন বলেছিল, যেকোনো জায়গায়, এখানে ভিড়ের মধ্যে ভালো লাগছে না। দময়ন্তী ওর চোখের দিকে একটুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনার ভালো না লাগলে যে আমারও ভালো লাগবে না-এমন কোনো কথা কোনোদিন হয়েছে কি আমাদের? তপন থতোমতো খেয়ে বলেছিল, না, না, তা বলছি না, যদি তোমার ভালো লাগে সে কথা আলাদা, আমার ভালো লাগছে না সেই জন্যই। দময়ন্তী বলেছিল, আপনার কী ভালো লাগে না, সেকথা আমাকে বলবেন না, আমি শুনতে চাই না। আপনার কী কী ভালো লাগে, সেকথা যেদিন বলতে চাইবেন, শুনব! সাধারণ একটা কথা। হয়তো বিশেষ কিছু না ভেবে, শুধু চালাকের মতন কথা বলার জন্যই দময়ন্তী ওকথা বলেছিল, তবু তপন তাতে দারুণ আঘাত পেয়েছিল। যেন দময়ন্তী তাকে মনে করিয়ে দিতে চায়, আপনি বড্ড বেশি কাছে আসবার চেষ্টা করছেন। আপনাকে যতখানি দূরে রেখেছি, ঠিক সেখানেই থাকুন।

পৌনে দশটা। সুবীর বলল, তপনদা, আপনি আর কতক্ষণ বসবেন! আপনি আজই এসে পৌঁছেছেন, টায়ার্ড নিশ্চয়ই, বিশ্রাম করুন গিয়ে বরং

তপন বলল, না, না, আমি একটুও টায়ার্ড নয়। আমি আর একটু বসি।

পৌনে দশটা। কাল রাতে এই সময় তপন রোমের একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খাচ্ছিল। ভোর রাত্রে প্লেন, এই সময় সে ডিনার শেষ করে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে একটা মেয়ের নাচ দেখছিল। সামান্য একটু জাঙিয়া আর কাঁচুলি পরা মোটা মতন মেয়েটা নাচছিল ঘুরে ঘুরে, তপনের টেবিলের পাশে এসে ওর ব্রাণ্ডির গ্লাসে একটা চুমুক দিয়েছিল- আর আজ এই সময় তপন কলকাতার একটা নার্সিং হোমের বেঞ্চে বসে আছে, একটি মেয়ে বাঁচবে কী বাঁচবে না এই প্রশ্ন নিয়ে।

মোটরসাইকেল আরোহী দু-জন পুলিস সার্জেন্ট এসে থামল গেটের সামনে, তারপরই একটা কালো গাড়ি। কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল গেটের দিকে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন বৃদ্ধ, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, হাতে একটা ছড়ি। তাকে পথ দেবার জন্য ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। লোকজনের কথাবার্তায় তপন বুঝতে পারল, উনি একজন মান্যগণ্য মন্ত্রী। সুবীর এগিয়ে গেছে সেই বৃদ্ধের দিকে, তিনি সুবীরকে দেখে বললেন, কী রে, এখন কেমন আছে খুকু?

জ্ঞান ফেরেনি এখনও।

জ্ঞান ফেরেনি? আমি সেই সন্ধ্যে থেকেই আসব আসব করছি, কিন্তু ক্যাবিনেটের মিটিং ছিল-চল দেখে আসি।

ডাক্তাররা এখন দেখা করতে দিচ্ছে না।

সুবীরের শেষ কথাটা হয় তিনি শুনতে পেলেন না কিংবা গ্রাহ্য করলেন না। চকচকে পাম্পশু-তে মচ মচ আওয়াজ করে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। তাঁর হাঁটা-চলার মধ্যে

এমন একটা গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা আছে, যেন স্বয়ং মৃত্যুও তাঁকে সম্ভম করবে। কিংবা অন্যদের পক্ষে ডাক্তারের বারণ খাটতে পারে, কিন্তু তিনি মন্ত্রী, তাঁর পক্ষে খাটবে কেন? তিনি দেখতে এসেছেন, দেখে যাবেন।

তপন সুবীরকে জিজ্ঞেস করল, উনি কে হন তোমার? সুবীর বলল, আমার মেশোমশাই। দিদিকে খুব ভালোবাসেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মন্ত্রীমহোদয় নীচে নেমে এলেন। এসেই কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ দিলেন। সুবীরকে ডেকে বললেন, জ্ঞান ফিরে এসেছে, বুঝলি, মিনিট পনেরো আগে –বাচ্চাটা গেছে অবশ্য, কিন্তু ওর আর ভয় নেই।

সুবীর বলল, আমরা দেখা করতে পারব এখন? কথা বলছে?

না, ডাক্তারকে আমি বলে এসেছি, একবার দেখা করে আয়, বেশীক্ষণ থাকিসনি, তবে আর কোনো ভয় নেই, বুঝলি।

মন্ত্রীর মুখখানি এমন হয়ে উঠল, যেন মনে হয়, ওঁর আসার জন্যই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে দময়ন্তী। ওঁকে দেখেই অসুখও ভয় পেয়েছে। আর একটু বেশি জুতোর আওয়াজ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুবীর চলে গেছে দো-তলায়। তপনকে ডাকেনি, তবুও তপন উঠে এল। কোণের কেবিনটার সামনে পাঁচ-ছ-জনের ভিড়। সুবীরের মা ওখানে রয়েছেন অনেকক্ষণ আগে থেকেই। অন্যদের আড়াল থেকে তপনও উঁকি দিল। দরজার দিকেই মুখ দময়ন্তীর, স্পষ্ট চোখে চেয়ে আছে। না, মোটা হয়নি, বরং আগের চেয়েও রোগা হয়েছে, যন্ত্রণায় এক একবার কুঁকড়ে উঠছে মুখ, অস্ফুটভাবে বলছে, মা, মা, বড় কষ্ট হচ্ছে। সুবীরের মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন চুলে, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন চোখ। একবার দময়ন্তী সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল, ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, মা ছেলেটা কেমন আছে? ছেলেটা?

সুবীরের মা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভালো আছে, সে ভালো আছে

ওকে আমার কাছে দিচ্ছে না কেন?

এখন তো দেয় না। পাঁচ-ছ-দিন বাদে।

না, নার্সকে বলল, ছেলেটাকে এখানে নিয়ে আসতে।

নার্স আনতে পারবে না, নিয়ম নেই।

না, তুমি নার্সকে বলো, আমি দেখব একবার।

সুবীর এগিয়ে গিয়ে দময়ন্তীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, দিদি, আমি এইমাত্র দেখে এলুম, তোর ছেলে ভালো আছে, খুব সুন্দর ছেলে হয়েছে তোর।

সুবীর সরে যেতেই একটু জায়গা ফাঁকা হয়েছিল, তপন সেখানে এগিয়ে এসেছিল। হঠাৎ দময়ন্তীর চোখ পড়ল তপনের দিকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ও কে? ও কে ওখানে?

সুবীর তাড়াতাড়ি বলল তপনদা, আমার মাস্টারমশাই ছিলেন, আজ বিলেত থেকে ফিরে তোকে দেখতে এসেছেন।

দময়ন্তী কিছুই শুনল না, আবার বলল, ও কে? কে ওখানে?

তপন নিজেই এবার বলল, আমি তপন, আমি

দময়ন্তী আবার গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কে? মা, ও কে?

সুবীরের কাকা ফিসফিস করে তপনকে বললেন, আপনাকে চিনতে পারছে না, আপনি বরং একটু সরে গিয়ে পিছনে দাঁড়ান। এখনও বিকার রয়েছে তো।

তপন দ্রুত সরে এল আড়ালে। আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল নীচে। তখনও কানে আসছে দময়ন্তীর ভয়ার্ত গলা, ও কে? ও কে? দময়ন্তী তাকে দেখে ভয় পেল? কেন, সে তো কোনোদিন দময়ন্তীকে কোনো আঘাত দেয়নি, কোনো ক্ষতি করেনি। সিঁড়ি দিয়ে নামছে তপন, তার বুকটা পাথরের মতন ভারী, নিশ্বাস আটকে আসছে গলার কাছে। সুবীরের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই তাকে অপয়া ভাবছে। তার কী দরকার ছিল এখানে আসবার? তাকে দেখে ভয় পাবার ফলে দময়ন্তীর অবস্থা যদি আবার খারাপ হয়ে যায়, কেউ কী তাকে ক্ষমা করবে; কিন্তু তার কী দোষ? আমি কি অন্যায় করেছি? আমি শুধু দময়ন্তীকে একবার দেখতে চেয়েছিলাম-আমি তো ওরা ভয় পাবার মতন কিছু করিনি! আমি তো আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম দময়ন্তী ভালো হয়ে উঠুক। আমার জীবনটাই কি অশুভ?

নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে তপন কতক্ষণ সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার খেয়াল নেই। যেন সে সব রাস্তা ভুলে গেছে, দিক ভুল হয়ে গেছে। একসময় সুবীর এসে পেছন থেকে তার হাত চেপে ধরল।

.

১০.

আমি তোমার বাবাকে চিনতাম। ঘটনাটাও মনে আছে, সে তো প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা, আমিও সেসময় ঢাকাতেই ছিলাম, তোমার বাবা প্রিয়নাথ রায় চৌধুরিকে নিয়ে সেসময় কী হইচই।

আজ্ঞে, প্রিয়নাথ রায়চৌধুরি ছিলেন আমার জ্যাঠামশাই। আমার বাবার নাম দেবনাথ রায়চৌধুরি।

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবনাথ। প্রিয়নাথ রায়চৌধুরির ঘটনাটাও আমি শুনেছি, তবে তাঁকে অবশ্য দেখিনি, কিন্তু দেবনাথ আমার থেকে বয়েসে ছোটো ছিল, কিন্তু কী সাহস, যেদিন ফাঁসি হল, সেদিনও গীতা-র শ্লোক পড়তে পড়তে–আমি তখন ওই একই জেলে।

কিন্তু আমার বাবার তো ফাঁসি হয়নি।

তোমার তখন কীই-বা বয়েস, তোমার কি কিছু মনে আছে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, দেবনাথ আর আমি একই জেলে ছিলাম ওখান থেকেই আমাকে পাঠানো হল বক্সা ক্যাম্পে, সেখানে সেই যে অম্বলের অসুখটা বাধিয়ে বসলাম।

আমার বাবার কিন্তু সত্যিই ফাঁসি হয়নি। আমি ভালোভাবে জানি।

ফাঁসি হয়নি দেবনাথ রায় চৌধুরির? সেই যে দেবনাথ একা রিভলবার নিয়ে তিন জন মিলিটারি অফিসারকে খুন করেছিল।

আমার বাবা রিভলবার চালাতেই জানতেন না। উনি সংস্কৃতের মাস্টার ছিলেন।

ওঃ হো, আর বলতে হবে না, আর বলতে হবে না, বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিলুম, বয়েস হয়ে গেছে তো, সব মনে থাকে না–

তোমার বাবা, দেবনাথ, একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ছুরি মেরেছিল। সেও কি কম সাহসের কথা? আমরা অবশ্য ওদের হিংসার পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছিলুম–দু-একজনকে ছুরি মেরে আর গুলি চালিয়ে তো দেশ স্বাধীন করা যায় না। তবে বড় খাঁটি লোক ছিল দেবনাথ, খুব কম কথা বলত, সে যে অমন কান্ড করবে–শোনো, তোমার বাবার কোনো ছবি আছে তোমার কাছে?

একটা গ্রুপ ফোটো আছে জানি, এ ছাড়া আলাদা কোনো ছবি আছে কিনা –।

গ্রুপ ফোটোতে হবে না, আলাদা ছবি আছে কিনা খুঁজে দেখো।

কী করবেন ছবি দিয়ে?

অয়েল পেইন্টিং করাব। আমরা মহাজাতি সদনে সব শহিদদের অয়েলপেইন্টিং টাঙাচ্ছি, দেখোনি?

কিন্তু আমার বাবাকে কি শহিদ বলা যায় ঠিক? ও রকম তো অনেকেই ছিলেন। আমার বাবা রাগের মাথায় একজন ইংরেজকে খুন করতে গিয়ে নিজেও খুন হয়েছিলেন।

তোমার বাবা একজন বিপ্লবী ছিলেন, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এজন্য বুঝি তোমার কোনো গর্ব হয় না? শ্রদ্ধা হয় না।

শ্রদ্ধা হবে না কেন? কিন্তু নিজের বাবা হলেও তাঁর সম্পর্কে কতকগুলো মিথ্যা প্রশংসা চাপানো তো ঠিক নয়। আমার বাবা ঠিক বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি কোনো সংগঠনেও যোগ দেননি, তিনি শুধু একটা পারিবারিক প্রতিশোধের জন্য।

মোটেই পারিবারিক প্রতিশোধের জন্য নয়। দেশমাতৃকার অপমানের প্রতিশোধের জন্য! যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না! দেশের জনগণ ওই সব মহৎ সন্তানদের কোনোদিন ভুলবে না। ওর একটা ছবি আমাদের চাই–দাঁড়াও এক সেকেণ্ড।

টেলিফোন বেজে উঠতেই মন্ত্রী মহোদয় টেলিফোন তুললেন। হ্যালো, কে বলুন, ও আচ্ছা! শোনো, তুমি ঠিক সাড়ে বারোটার সময় অ্যাসেম্বলিতে আমার চেম্বারে ফোন করবে। এখন ব্যস্ত আছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি তখন দেখা হবে।

যাবার ছবির প্রসঙ্গ উঠতেই তপনের মনটা লণ্ডনে অ্যালিসের ঘরে চলে গিয়েছিল। সেই দেয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ ছবি। তার বাবার পূর্ণাঙ্গ ছবি ওখানেই শুধু দেখেছে তপন। ইস, অ্যালিসের সঙ্গে ঝগড়া না করে, ওই ছবিটার একটা কপি করিয়ে নিয়ে এলে হত। কিন্তু কী হত ছবি দিয়ে। কোনো প্রয়োজন নেই আর। মহাজাতি সদনে তার বাবার ছবি টাঙাবার

কোনো উৎসাহ নেই তপনের। অ্যালিসের কথা মনে পড়তে তপনের আর রাগ হল না এখন, বরং ক্ষণিকের মন খারাপ অকারণ ঝিলিক দিয়ে গেল।

কলকাতায় তপনের তিনদিন কেটে গেছে। দময়ন্তী, সংকট কেটে গিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। সুবীর সবসময় লেগে রয়েছে তপনের সঙ্গে। এই তিনদিনে কলকাতায় পরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তপনের, দিবাকরদের বাড়িও ঘুরে এসেছে একবার। বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে, তার প্রায় সকলেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শেষপর্যন্ত তপনকে বলেছে, তপন তাদের জন্য আমেরিকায় কোনো সুযোগ করে দিতে পারে কিনা। তপন যেন কোনোদিন এখানে ফিরে না আসে তা হলে সেটা দারুণ বোকামি হবে। একমাত্র সুবীরই তাকে ওসব কিছু বলেনি, সুবীরের ইচ্ছে তপন আর যেন বিদেশে ফিরে না যায় তপন এখানেই ভালো কাজ করার সুযোগ পাবে। সুবীর প্রায় জোর করেই তপনকে আজ সকাল বেলা তাঁর মেসোমশাই, এই মন্ত্রীর কাছে নিয়ে এসেছে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ মন্ত্রী দু-হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ কচলালেন চশমা খুলে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার পর গাঢ় গলায় বললেন, তোমরা এখনকার দিনের ছেলেরা বুঝতেই পারবে না, কী উন্মাদনা ছিল তখন। জোয়ান জোয়ান, ভালো ভালো বংশের কত ছেলে, সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমিই তো জেল খেটেছি মোট এগারো বছর চার মাস, ইলেভেন ইয়ার্স ফোর মানথস, সেখানেই তো চুল পেকে গেল! দেখো না এক তোমাদের পরিবার থেকেই দু-জন, তোমার বাবা আর জ্যাঠা প্রাণ দিয়েছেন, আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে দেশের আরও কত উপকার হত, আমার বদলে ওঁরাই মন্ত্রী হতেন।

তপন বলল, না, হতেন না–।

হতেন না? তুমি কী করে জানলে? মন্ত্রী হওয়াটা কি দোষের ব্যাপার নাকি?

না, তা বলছি না। আপনিই তো বললেন ওঁরা ছিলেন বিপ্লবী। ওঁরা হিংসার পথ নিয়েছিলেন, গান্ধীজির কথা শোনেননি। যাঁরা গান্ধীজির চ্যালা হননি–দেশ স্বাধীন হবার

পর তাঁদের একজনও কী দেশের কোনো উঁচুপদ পেয়েছেন? পাননি। তাঁদের দেশপ্রেম তো মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাঁরা তো সব ছিলেন পাগল!

অ্যাঁ? কী বললে? কে বলেছে তোমায় এসব কথা। এসব বুঝি বিলেতে শিখেছ? দাঁড়াও এক মিনিট।

মন্ত্রীমশাই আবার টেলিফোন ধরলেন। আবার বললেন, হ্যালো, কী? কোন ডিস্ট্রিক্ট বললে? ও আচ্ছা! শোনো ওসব কথা এখন হবে না, পরে টেলিফোন করে অ্যাসেম্বলিতে আমার চেম্বারে।

সুবীর তপনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, তপনদা, মেসোমশাইয়ের ব্লাড প্রেসার আছে, ওঁকে বেশি চটাবেন না।

তপন উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মন্ত্রীর ঘরখানা দেখতে লাগল। বেশ বড়ো ঘর, ঘরখানার মধ্যে একটা শুভ্রতা আছে। মনে হয় দেওয়ালগুলো দু-চারদিন আগেই হোয়াইটওয়াশ করা হয়েছে, এমন ধপধপে সাদা! চেয়ার-টেবিল নেই, একটা নীচু মতন তক্কোপোষের ওপর সাদা চাদর বিছানো, টি-পয়ের ওপর ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা, দু-টি টেলিফোন–দু টিরই রং সাদা। পাখা নেই, এক কোণে এয়ারকুলার বসানো–বেশ মনোরম ঠান্ডা আবহাওয়া। তপন একটা জিনিস লক্ষ করল, টেলিফোন গাইড ছাড়া, সারাঘরে একখানাও বই নেই।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে মন্ত্রী একটু হাসলেন তপনের দিকে তাকিয়ে। টেলিফোনের কথার সূত্র ধরেই হাসলেন, না তপনকে দেখে তার কোনো হাসির কথা মনে পড়ল, তা ঠিক বোঝা গেল না। হাসতে হাসতে বললেন, তুমি বিলেতে থেকে থেকে কমিউনিস্ট হয়ে যাওনি তো? এখানকার সব কমিউনিস্ট নেতাই তো বিলেতফেরতা। এখন তো আবার ওখানে লেবার পার্টির যুগ। আমার এক জামাই-ই তো

তপনও সামান্য হেসে বলল আমি বিলেতে কখনো দু-এক সপ্তাহের বেশি থাকিনি।

ওঃ হো, তুমি তো জার্মানিতে না? বিলেতেও তো আজকাল সে সুবিধে নেই, এখন তো তাড়িয়ে দিচ্ছে। আর কোথা থেকেই বা তাড়াচ্ছে না, এমনকী আফ্রিকা থেকেও ভারতীয়দের ইয়ে দিচ্ছে, গলা ধাক্কা-সিংহল থেকে, বার্মা থেকে-যাকগে, আমি সামনের মাসে দিল্লি যাচ্ছি, নাজির কাছে তোমার কথাটা পাড়ব-নেহরুজি তো চাইতেনই দেশের গুণী ছেলেদের বিদেশ থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে, লালবাহাদুরও তাই চান, বলব এখন দেবনাথের ছেলে তুমি, চেহারারও মিল আছে, জেলখানায় দেবনাথ আর আমি পাশাপাশি সেলে ছিলাম।

তপন আর মনে করিয়ে দিল না যে তার বাবা কোনোদিন জেল খাটেননি। একথাটাই মন্ত্রীর মনে থাকছে না, অথচ তিনি কী করে তপনের চেহারার সঙ্গে তার বাবার চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছেন, কে জানে।

মন্ত্রী আবার বললেন, তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুমা কেউ বেঁচে আছেন?

ঠাকুমা বেঁচে আছেন।

ঠিক আছে, তুমি ঠাকুমার নাম করে আমার কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে, আমি ওঁর জন্য একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেব-ওঁর ছেলেরা দেশের জন্য এত করেছেন।

তার বোধ হয় দরকার নেই। আমার ছোটোকাকা ভালোই রোজগার করেন, নিজের মায়ের খরচ নিশ্চয়ই চালাতে পারবেন।

তাহলে অবশ্য, ইয়ে, ভিক্ষের টাকা নেবে কেন? আরও কত নিডি লোক আছে, পলিটিক্যাল সাফারার তো কম নেই। যাক আমার বেশি সময় নেই, শোনো, আমাদের স্টুডেন্টস হেলথ হোমের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট দরকার-তুমিই লেগে পড়ো না।

হেলথ হোমের সুপারিনটেনডেন্ট? আপনি ভুল করছেন, আমি ডাক্তার নই।

ডাক্তার নও? তবে যে ছোটো খোকা বললে।

সুবীর চুপচাপই বসে ছিল আগাগোড়া। এবার তাড়াতাড়ি বলল, না, মেসোমশাই, আমি তা বলিনি। আমি বলেছিলাম, তপনদা বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে নিউ ক্লিয়ার ফিজিকস-এর ওপর পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করেছেন, ওঁকে যদি এখানে কাজ করার সুযোগ দিয়ে এদেশে আটকে রাখা যায়।

ও, পিএইচ ডি-র ডাক্তার। তাই বলো! তা হলে তো- ।

একজন সুবেশ যুবক ঘরে ঢুকে গৃহভৃত্যের মতন বিনীতভাবে মন্ত্রীর কানের পাশে কী যেন বলল। মন্ত্রী হাত নেড়ে বললেন, এখন না, এখন না, বসতে বলো ওঘরে, আর শোনো, চেম্বার অব কমার্সের ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসবার কথা আছে, এলে খবর দিয়ে!

মন্ত্রী আবার তপনের দিকে চেয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বললেন, তাহলে, তাহলে, আর একটা হয়, আমরা কংগ্রেস থেকে ডে-স্টুডেন্টস হোম খুলছি-মেধাবী ছাত্ররা বিনা পয়সায় থাকা খাওয়া পাবে, পড়াশুনো করবে-তুমি তার একটার ভার নাও না। মাইনে বেশি পাবে না কিন্তু যদি মানিয়ে নিতে পার- এইতো খালি আছে এখন দেখতে পাচ্ছি।

আপনি আমার সম্বন্ধে বোধ হয় ভুল ধারণা করেছেন। আমি আপনার কাছে কোনো চাকরি চাইতে আসিনি।

তবে কী জন্য এসেছ?

তপন কিছু বলার আগেই সুবীর বলল, আমি তপনদাকে নিয়ে এসেছি, আমার মাস্টারমশাই ছিলেন।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি ওর জন্য কী করব এখন? চাকরি-বাকরির যা বাজার এখন, এর থেকে ভালো কোনো কাজ তো ঠিক এই মুহূর্তে।

তপন বলল, আমি আপনার কাছে ভালো-মন্দ কোনোরকম চাকরি চাইতে আসিনি! আপনার কাছে বুঝি সবাই চাকরি চাইতে আসে?

তাই তো আসে। সকালবেলা দু-ঘণ্টা সময় বাইরের লোকের জন্য রেখেছি, কারুর চাকরি, কারুর হাসপাতালে ভরতির ব্যবস্থা, কার বাড়ি অর্ধেক তৈরি হয়েছে তার জন্য সিমেন্টের পারমিট, বোঝে না তো, সবাইকে খুশি করা, সবার দাবি মেটানো সম্ভব নয়।

সবার মানে দেশের সব লোক, না, আপনার কাছে যারা অনুগ্রহ চাইতে আসে, শুধু তারা

মন্ত্রী গম্ভীর হয়ে বললেন, তা বলল, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি! তুমি কীজন্য এসেছ?

তপন এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। মন্ত্রী হঠাৎ ঘর ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন, যেন ওই হাসিতে আগেকার সব কথাবার্তা মুছে গেল। তিনি এখন নতুন মানুষ!

সুবীর তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অধৈর্য হয়ে বলল, চলুন, তপনদা, এবার ওঠা যাক। মেসোমশাই এখন স্নান করতে যাবেন।

মন্ত্রী বললেন, না, না, আর দু-মিনিট বোসো। তপনের দিকে চেয়ে বললেন, দেখতে এসেছ তা কী দেখলে বলো!

ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব।

তুমি ইয়ংম্যান, তোমার আবার ভয়টা কী! আমরাই বরং তোমাদের ভয় করব!

দেখলাম, দেশের জন্য একসময় আপনারা অনেক ত্যাগ করেছেন, জেল খেটেছেন, আজ তার যোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তার ফলে আপনাদের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, আপনারা আগেকার সব কথা ভুলে গেছেন!

ভুলে গেছি? কীরকম? কীরকম? তুমি কী করে জানলে?

আগে আপনারা ছিলেন জনতার একজন। এখন আপনারা, সেই জনতা থেকে দূরে সরে গেছেন! আগে আপনারা ইংরেজের লাঠি-বন্দুকের বিরুদ্ধেও অসীম সাহসে এগিয়ে গিয়েছিলেন আজ জনতা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আপনারা ঠিক ইংরেজের মতনই তাদের বিরুদ্ধে লাঠি-বন্দুক এগিয়ে দেন। কোনোদিন তাদের সামনে গিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদেরই একজন, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, আমি ক্ষমা চাইছি। পরাধীন দেশকে পায়ের নীচে রাখার জন্য ইংরেজরা যে শাসনযন্ত্র বানিয়েছিল, আজ আঠারো বছর ধরে সেই শাসনযন্ত্রই আপনারা আঁকড়ে রয়েছেন। আজ আপনারা আর দেশপ্রেমিক নন, আপনারা পলিটিসিয়ান–আপনারা শুধু চান, কী করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। রাগ করবেন না, আপনার কথা শুনে আমার রাজা-মহারাজাদের কথা মনে পড়ছিল, আমাকে চাকরি দিয়ে কিংবা আমার ঠাকুমাকে মাসোহারা দিয়ে আপনি যেন দয়া দেখাতে চান–যেন এসবই আপনার নিজের সম্পত্তি।

দু-জন যুবক আবার এসে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রীর পাশে। তিনি তাদের দিকে হাত নেড়ে বললেন, না ঠিক আছে এখন যাও!

তপনের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি যা বললে তার খানিকটা সত্যি, এমন কিছু নতুন কথা বলনি। কিন্তু আমরা বদলাবার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করলেও সহজে বদলানো যায় না–দু-শো বছরের জঞ্জাল কি কুড়ি বছরে সাফ করা যায়। আসলে আমাদের দোষ কী জান, নির্বাচনের আগে আমাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়–আমরা নিজেরাও জানি, সেসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, দেশের এ অবস্থায়। কিন্তু লোকে যে রূপকথা শুনতে চায়! তুমি বিদেশে ছিলে তো–তাই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিন্তু তোমার ওই আমেরিকায় একজন লোকের মাথাপিছু আয় কত? সে তুলনায় এই দেশে।

আমি অন্য কোনো দেশের কথা ভাবছি না, এদেশের কথাই ভাবছি। আপনারা কতখানি বদলাতে পেরেছেন, সেটা বড়ো কথা নয়, কথা হচ্ছে আপনাদের চেষ্টা কতখানি আন্তরিক। আন্তরিক নয় বলেই আপনারা সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে এসে এক-একটা দুর্গের মধ্যে বাস করছেন। আপনারা সেকালের রাজাদের মতন চোখ দিয়ে শোনেন, কান দিয়ে দেখেন এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন না। সবসময় একদল লোক আপনাদের ঘিরে রেখেছে, আজ আপনারা মাঝে মাঝে দয়া করে কারুকে চাকরি, কারুকে পারমিট বিলোচ্ছেন! এদেশে কেউ কোনোদিন কোনো মন্ত্রীকে সাধারণ মানুষের মতন ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতে দেখেছে? পাড়ার চায়ের দোকানে কোনো মন্ত্রী কখনো চা খেতে যায়? মন্ত্রীদের একজন আত্মীয়স্বজনও গরিব থাকে না কেন? মন্ত্রীর বাড়ির চাকরকেও লোকে খাতির করে–একী গণতন্ত্র, না রাজতন্ত্র?

ঘরে এখন অনেক লোক। তপনের গলা আবেগে অভিভূত, পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাত দুটো মুঠো করে রেখেছে। মন্ত্রীর মুখে ক্রোধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, খানিকটা হাসিমুখেই তিনি তপনের দিকে চেয়ে আছেন। সুবীরের মুখটা শুকনো। একটু কেশে গলা সাফ করে মন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনলেন, খুব আস্তে আস্তে বললেন, সেন্টিমেন্টাল, বড্ড সেন্টিমেন্টাল! আজ অ্যাসেম্বলি আছে, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না! যাক ওসব কথা থাক। তোমার নিজের কথা শুনি। তুমি এখন কী করবে ঠিক করেছ?

আমি কিছুই ঠিক করিনি।

তুমি নিজের থেকেই দেশের কোনো একটা কাজে নেমে না পড়ে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ কেন?

আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমি আপনার কাছে কোনো সাহায্য চাইতে আসিনি।

এসেছ, নিশ্চয়ই এসেছ। আমি তোমাকে যে যে কাজের কথা বললাম, তার একটাও তোমার পছন্দ হয়নি, তাই রেগে গেছ। একটা সত্যি কথা বলো তো! আমি যদি এক্ষুনি

তোমাকে একটা খুব বড়ো চাকরি দিয়ে দিই, তাহলে কি তুমি সেটা নেবে না? কিংবা তখনও আমার সমালোচনা করবে? ঠিক সত্যি কথা বলো, অনেককেই তো দেখলাম।

শুনুন, বিদেশে আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আমি যা পাই, টাকার অঙ্কে তা প্রায় সাত হাজার টাকা। এখানে আমাকে সাত হাজার টাকা মাইনের কোনো চাকরি হঠাৎ দেবার ক্ষমতা বোধ হয় আপনারও নেই। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে ওই প্রশ্নটা ওঠে না।

শোনো, একটা কথা বলি। মনে করো, আমি মন্ত্রী-টন্ত্রী কেউ নই, তোমার বাবার বয়েসি একজন বৃদ্ধ, সেই হিসেবে বলছি আমি তোমার কথায় রাগ করিনি–কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি ভয় পাচ্ছি। তোমার বয়েস তো বেশি নয়, কিন্তু তোমার গলায় একটা তিক্ততা এসেছে, মুখে একটা বেপরোয়া ভাব, যেন পৃথিবীর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই–এই ভাবটা ভালো নয়, এতে মানুষ কোনো কাজই সম্পূর্ণভাবে করতে পারে না। জীবনটা এতে জ্বলে-পুড়ে যায়–বড়ো অশান্তি আর যন্ত্রণা পাবে তুমি

তপন হঠাৎ মুখ তুলে একটু হেসে বলল, আপনি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন না তো? মন্ত্রী একটু ফ্যাকাশে ভাবে হাসি আনার চেষ্টা করলেন, আবেগে তাঁর গলা কেঁপে উঠল, বললেন, না, না, বাবা, আমি তোমাকে অভিশাপ দিতে চাই না! জীবনে ক-টা মানুষের ভালো করতে পেরেছি, তা জানি না, কিন্তু সজ্ঞানে কারুর মন্দ করতে চাইনি। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি, যেখানেই থাক, শান্তিতে বেঁচেবর্তে থাক, আমরা বুড়ো হয়েছি, আমরা আর ক-দিন, কিন্তু তোমরা যদি শান্তি না পাও–

১১-১২. আমেদপুর স্টেশনে

আমেদপুর স্টেশনে কাকা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, লিখেছিলেন। ট্রেন থেকে নেমেই তপন দেখল, স্টেশনে কাকা-কাকিমা এবং তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভারতবর্ষে ফেরার পর এই প্রথম তপনকে কেউ অভ্যর্থনা জানাল। কামরার দরজায় তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল টুকু আর সন্দীপ, কুলি না ডেকে নিজেরাই নামাতে লাগল তপনের মালপত্র।

প্রণাম-ট্রনামের পাঠ তপন বহুদিন চুকিয়ে দিয়েছে, মানুষের পা স্পর্শ করতে তার গা শিরশির করে। এখানে আসবার আগে তপন ঠিক করে রেখেছিল একমাত্র ঠাকুমা ছাড়া আর কারুকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। কিন্তু সে ইচ্ছে টেকেনি। অনেককেই প্রণাম করতে হয়েছে, এমনকী সুবীরের মেসোমশাই সেই মন্ত্রীকেও-কেন-না, সুবীর প্রণাম করার পর তিনি এমনভাবে পা-জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন তপনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তখন আর না করে পারা যায় না। এখানেও তাই হল, টুকু আর সন্দীপ ঢিপ ঢিপ করে তপনকে প্রণাম করে ফেলতেই, তপন কাকার দিকে তাকাল, বুঝতে পারল, প্রণামের পর কাকা কী আশীর্বাদ করবেন তাও তৈরি করে রেখেছেন। তপন বাধ্য হয়ে নীচু হল।

টুকু বলল, বড়দা, সাহেবদের মতন লালচে রং হয়েছে তোমার!

কাকিমা বললেন, কী সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে তপনের!

কাকা বললেন, কী রে তপু, তোকে যে প্রায় চেনাই যায় না।

সন্দীপ কথা না বলে লাজুকভাবে হাসল শুধু।

কাকিমার ব্যবহার দেখেই তপন মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছিল। কাকিমা কোনোদিনই তপনকে সেরকম পছন্দ করতেন না, কলেজ ছুটির সময় তপন মাঝে মাঝে সিউড়িতে আসত, কাকিমা নানা ছুতোয় তপনকে খাটিয়ে মারতেন। একবার তো দুবরাজপুর থেকে

খেজুর গুড়ের হাঁড়ি বয়ে আনতে হয়েছিল তপনকে। এখনও তপনের স্পষ্ট মনে আছে, ছেলেবেলায় তপনকে বাদ দিয়ে কাকিমা শুধু তাঁর ছেলে-মেয়েদের ভাতের থালায় ঘি দিতেন, খুব লুকিয়ে কৌশলে ব্যাপারটা করতেন কাকিমা, কিন্তু ঘিয়ের গন্ধ তপন ঠিক টের পেয়ে যেত, আর তখন তার খুব খারাপ লাগত। সেই কাকিমাই আজ কী দারুণ আদিখ্যেতা করছেন তপনকে নিয়ে–তপন প্রণাম করার পর তপনের থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে চুমু খেলেন পর্যন্ত।

মায়ের সঙ্গে কাকিমাও খুব ভালো ব্যবহার করতেন না, কিন্তু মায়ের সঙ্গে কারুর ঝগড়াঝাঁটি হওয়াই ছিল অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই দুঃখকষ্ট পেয়ে পেয়ে মায়ের যেন কোনো প্রত্যাশাই ছিল না। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিতেন না মা, ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সারাদিন খাটতেন মুখ বুজে, ঘুমোতে যেতেন সবার শেষে, কারুর কিছু বলার দরকার হত না-কাজ করা ছিল মায়ের নেশা। কাকিমা বড়োলোকের মেয়ে, বিয়ে হবার পরও তাঁকে কিছুই করতে হয়নি–মা-ই গোটা সংসারটা সামলে রেখেছিলেন–সুতরাং কাকিমা মা-কে বেশি আঘাত দিতে সাহস পেতেন না। টুকু আর সন্দীপও তো তপনের মায়ের হাতেই মানুষ।

তপন ভেবেছিল সেসব পুরোনো কথা আর ভাববে না, সেসব তো সব চুকেবুকে গেছে, এখন এসেছে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে, টুকুর বিয়েতে হইচই আনন্দ করে চলে যাবে। কিন্তু মনে যে পড়ে যাচ্ছে সব। কাকিমার উচ্ছ্বাসে সহজভাবে সাড়া দিতে পারছে না।

লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। এসব রাস্তা তার বড়ো চেনা, এই মাঠের ওপারে আকাশ, পুকুর পাড়ের তালগাছের সার, খড় বোঝাই গোরুর গাড়ির দল–এসব কিছুই বদলায় নি। এসব দেখলে অকারণেই বুক টনটন করে ওঠে।

টুকু আর সন্দীপ হাজার প্রশ্ন তুলেছে বিলেত-আমেরিকা সম্পর্কে। এ-পর্যন্ত তার বিদেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কেউ এত কথা জানতে চায়নি। টুকু বলল, আচ্ছা বড়দা, আমেরিকায় নাকি এমন আছে, একটা দরজা বন্ধ, কিন্তু তুমি যেই তার সামনে দাঁড়ালে, অমনি আপনি

আপনি সেটা খুলে গেল? সত্যি? তপন হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি ওই সব দরজার কলকজা শিখে এসেছি, ইচ্ছে করলে সিউড়ির বাড়িতেও বানিয়ে দিতে পারি।

সত্যি বানিয়ে দেবে?

কাকিমা বললেন, আঃ চুপ কর না ছেলেটা এই মাত্র এসেছে, আগে একটু বিশ্রাম নিতে দে। তপু, তুমি কয়েক মাস থাকছ তো?

না কাকিমা, দিন সাতেক থাকব। এই টুকুর বিয়ের ক-টা দিন।

ওমা, সে-কী! মোটে একই দিনের জন্য–এত পয়সা খরচ করে এলে।

না, বড়দা, তুমি যেতে পারবে না। তোমাকে আমরা আটকে রাখব।

তুই আর কোথায় থাকবি? তুই তো বিয়ের পরই পালিয়ে যাবি। তোর বর কোথায় যেন থাকে, দুর্গাপুরে?

সন্দীপ বলল, বড়দা, তুমি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ উঠেছ? আচ্ছা, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যখন জেট প্লেন আসে, তখন কেমন লাগে?

কাকা বললেন, তুই কি আবার ফিরে যাবি, ঠিক করেই এসেছিস? কেন, এখানে যদি কোনো চান্স-টান্স পাস

না, কাকা, এখানে আমি কাজ করব না।

-এখানে অবশ্য স্কোপও তেমন নেই, তুই ফিরে গিয়ে দেখিস যদি সন্দীপটার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস।

এখনই কী? সন্দীপ আগে পড়াশুনো শেষ করুক।

আগে যা ছিল, কাকা তার থেকে বাড়িটাকে আরও বাড়িয়েছেন। সামনে অনেকখানি বাগান, পেছনে গোয়ালঘরে দুটো মুলতানি গোরু, সারাবাড়ির চারদিকে পাঁচিল উঠেছে, লোহার গেট, বাথরুমে রঙিন টালি আর সিঙ্ক বসানো হয়েছে–কাকার অবস্থা আগের থেকেও অনেক ভালো। কাকার শ্বশুর এখানকার নামকরা ডাক্তার ছিলেন, তিনিই কাকাকে এখানে এনেছেন, কাকা তাঁর শ্বশুরের প্র্যাকটিশ পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

ঠাকুমার বয়েস আশি পেরিয়ে গেছে, এখন আর হাঁটা-চলা করতে পারেন না ভালো করে। এক তলার বাগানের দিকে নিজের ঘরেই বেশিরভাগ থাকেন। জুতো খুলে ঠাকুমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তপন চেঁচিয়ে বলল, কী বুড়ি, কেমন আছ–! ঠাকুমা বললেন, এসেছিস, আয়–আমার সোনা! প্রণাম করল না, তার আগেই তপন ঠাকুমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

ঠাকুমার দৃষ্টি খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা বোঝা যায়। তিনি চোখে আর ভালো দেখতে পান না। তপনের মুখে-গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কতদিন দেখিনি রে আমার সোনাটাকে। মনে ছিল এই বুড়িটার কথা? খাওয়া হয়নি তো এখনও? যা আগে স্নান-খাওয়া করে আয় নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটা দেওয়া হয়েছে তপনকে। তপনের সবচেয়ে হাসি পেল শুনে যে শুধু তারই জন্যে কয়েকদিন আগে দো-তলায় বাথরুমে কমোড বসানো হয়েছে, যাতে দিশি কায়দার পায়খানায় তার অসুবিধে না হয়। সিউড়িতে তপনের আগেকার চেনাশুনো যারা ছিল, তাদের কারুর সঙ্গেই দেখা করতে গেল না। তপনের মনে আছে, এই সিউড়িরই একটা ছেলে একবার বিলেত থেকে ফিরেছিল মেম বিয়ে করে, কিন্তু সে যে সাহেব হয়ে যায়নি, সেটা প্রমাণ করার জন্য কী বাড়াবাড়িই না করত। ঘুরে ঘুরে সবাইকার বাড়ি গিয়ে মাসিমা, কাকিমা বলে ডাকাডাকি করত। চেয়ার এগিয়ে দিলেও তাতে না বসে মাটিতে বসে পড়ে বলত–আমার মাটিতে বসতেই খুব ভালো লাগে–চা-টোস্টের বদলে খেতে চাইত মুড়ি আর তেলেভাজা।

সন্দীপ আর টুকুর অসংখ্য প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। এখানে এসে তপনের খেয়াল হল, ওদের জন্য কিছু উপহার আনা উচিত ছিল, তপন কিছুই আনেনি। কাকিমা বেশ নিরাশ হয়েছে বোঝা যায়। তপন নিজের হাতঘড়িটা উপহার দিয়ে দিয়েছে সন্দীপকে, তার দাড়ি কামাবার সেট, কলম–এসব দিয়ে যাবে ঠিক করেছে। তার নতুন সুদৃশ্য সুটকেশ দুটোই দিয়েছে টুকুকে বিদেশি যেকোনো জিনিসই ওদের কাছে আঃ কী ভালো, কী সুন্দর দেখতে, না? টুকু সবচেয়ে খুশি হয়েছে তপনের ওডি-কোলনের শিশিটা পেয়ে ওরকম সুন্দর শিশি আর ওরকম খাঁটি ওডি-কোলোনের নাকি টুকুর বন্ধুরা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি। কী চমৎকার স্প্রে করা যায়।

টুকুর হাবভাব দেখে তপনের খুব ভালো লাগে। পাঁচ-ছ বছর আগে টুকু খানিকটা নির্জীব নিরীহ মেয়ে ছিল। এখন সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে, চরিত্রে এসেছে চঞ্চলতা, বিয়ের আনন্দে সবসময় ছটফট করছে। এই ঘরে বসে গল্প করছে, আবার ফুড়ুৎ করে চলে যাচ্ছে কোথায়–সকাল বেলার শিশির ভেজা ফুলের মতন ওর মুখে সবসময় একটা পাতলা খুশি মাখানো। মেয়েদের রূপ এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি খোলে।

ছাদে একটা ঘর বানানো হয়েছে, এখনও সেখানে কোনো আসবাবপত্র আসেনি। যেখানে ঘরটা হয়েছে, আগে ওখানেই থাকত জলের ট্যাঙ্ক। প্রথম সিগারেট খেতে শিখে তপন ওই জলের ট্যাঙ্কের ধারে বসেই দুপুরে সিগারেট খেত। সেই কথা মনে পড়ায়, তপন এখনও মাঝে মাঝে সিগারেট খাবার সময় ছাদে উঠে আসে। নতুন ঘরটায় তপন পায়চারি করছিল, হঠাৎ কাছেই পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল টুকু। একটু আগেই টুকু নীচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কখন যেন উঠে এসেছে। তপন জিজ্ঞেস করল, কী রে, ঘুমোলি না?

টুকু গম্ভীরভাবে বলল, বড়দা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

কী কথা?

বলো, তুমি কারুকে বলবে না?

কী ব্যাপার, বল না।

না, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলল, কারুক্কে বলবে না?

আরে, কী হল কী তোর। আচ্ছা, কারুকে বলব না, কী ব্যাপার?

বড়দা, একটা ব্যাপারে আমার খুব ভয় করছে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে? তোমার বিমান দত্তকে মনে আছে?

কে বিমান দত্ত?

ওই যে লাইব্রেরিতে বই দিত, তোমার কাছে আসত মাঝে মাঝে।

ও হ্যাঁ, বিমান, মনে আছে। কী হয়েছে?

টুকু একটু চুপ করে রইল আঙুল দিয়ে আঁচল জড়াতে লাগল। কাঁচা-হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরে আছে, টলটলে মুখখানায় আশঙ্কার ছায়া। তপন ওর থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, কী হয়েছে ব্যাপারটা বল তো?

বিমান আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

তপন হা-হা করে হেসে বলল, তাতে দোষের কী হয়েছে? তুই যেমন সুন্দরী তোকে তো অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে। এতে আর আশ্চর্য কী!

ও খুব রেগে গেছে!

তোর অন্য জায়গায় বিয়ে হচ্ছে বলে? তা তো রাগবেই। তোর হাত ধরে গদগদভাবে তোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তো? তুই কী বলেছিলি?

বড়দা, তুমি ঠাট্টা কোরো না। আমার মনের মধ্যে এমন হচ্ছে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যা ভুল করেছি। আমি ওকে চার-পাঁচখানা চিঠি লিখেছি। ওর বোন সবিতা তো আমার বন্ধু, গরমের ছুটিতে ওদের বাড়িতে রোজ পড়তে যেতাম।

কী লিখেছিলি চিঠিতে? তুইও ওকে ভালোবাসিস এই তো! তা কী হয়েছে তাতে। তোর বর জেনে ফেলবে? আরে, তোর বরও কি ওরকম দু-চারটে চিঠি অন্য কোনো মেয়েকে লেখেনি? নিশ্চয়ই লিখেছে। ওতে কিছু হয় না। আর কিছু করেছিস নাকি? চিঠি লেখা ছাড়া?

না, না, সেসব কিছু না, সত্যি বলছি বিশ্বাস করো।

যাকগে ওসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে না, যা!

বড়দা, তুমি জান না, ও বলেছে বিয়ে ভেঙে দেবে। ও যা গোঁয়ার-দীপুটা আবার ওকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছে, সেদিন ও যদি কিছু করে। আমি আত্মহত্যা করব!

আচ্ছা টুকু, একটা কথা বলত! বিমানকে তো দেখতে খারাপ নয়, ভালোই চেহারা, লেখাপড়াতেও ভালো–ওর সঙ্গে তোর ভাব হয়েছিল, তা ওকেই বিয়ে করলি না কেন তুই? আর যে ছেলেকে তুই এখনও দেখিসনি–তাকেই বিয়ে করতে কেন রাজি হলি?

তুমি তো জানো না, গত বছর কী কান্ড হয়েছে! মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানের সময় বিমানদা-র বাবার সঙ্গে আমার বাবার কী দারুণ ঝগড়া! মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কোর্টে কেসও হতে যাচ্ছিল। মা আমার ব্যাপারটা একটু একটু জানত-বাবাকে বলেছিল, বাবা নাকি বলেছিলেন, আমার মেয়েকে কেটে ফেলে দেব, তবু ওই রাস্কেলের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না!

লুকিয়ে বিয়ে করলেই পারতিস! বাবাতে বাবাতে তো আর বিয়ে হবে না। বিয়ে হবার কথা তোর সঙ্গে বিমানের-তোর বয়সও কম না, তেইশ হয়েছে তো, না। দুই বাবার ঝগড়া বলে তোদের ভালোবাসা কেন মিথ্যে হয়ে যাবে।

না, বড়দা, তুমি ওকথা বোলো না!

তপনের নিজের কথাই নিজের কানে খট করে লেগেছে। টুকুকে যে ব্যাপারে সে উপদেশ দিতে চাইছে, সে ব্যাপারে তো সে নিজের সম্পর্কে মানেনি! অ্যালিসকে অত অপমান করেছিল কেন সে, অ্যালিসের কী দোষ? তার বাবার সঙ্গে অ্যালিসের বাবার শত্রুতা হয়েছিল তার জন্য তারা দুজনের কেউ-ই তো দায়ী না! কিন্তু, না, না, সেটা অন্য ব্যাপার।

না, না, অ্যালিসের ভালোবাসা তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব না, সেও অ্যালিসকে ভালোবাসতে পারবে না।

বড়দা, তুমি আমার কোনো কথা শুনছ না! ও যদি এখন সেই চিঠিগুলো-

ধুৎ বোকা মেয়ে! আমি কি এখন গুণ্ডা লাগিয়ে চিঠিগুলো কাড়িয়ে আনব নাকি! চিঠি লিখেছিস তো কী হয়েছে। চিঠিতে শুধু ভালোবাসার কথা লিখেছিস তো? ওতে কোনো দোষ নেই।

কিন্তু আমার ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, শুধু তোর ভয়ই করছে; দুঃখু হচ্ছে না বিমানের জন্য?

মোটেই না! ও এখন আমার নামে যা-তা কথা বলে বেড়ায়। চিঠির কথাও অনেককে বলেছে, ওদিন যদি কিছু একটা করে।

অকারণেই তপন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ইয়ার্কির সুরে বলল ঠিক আছে, বিয়ের দিন আমি বিমানকে চোখে চোখে রাখব। যদি পকেট থেকে চিঠি-ফিটি বার করার চেষ্টা করে, খপ করে ওর হাত চেপে ধরব? কিন্তু কোনো ছেলে আজকাল ওরকম করে না রে!

বড়দা, তুমি কোনোক্রমে ওর কাছ থেকে চিঠিগুলো চেয়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলতে পার না? ও তোমাকে ভক্তি করে।

আমি দাদা হয়ে ওর কাছে গিয়ে বলব, কী হে, আমার ছোটে বোন তোমার কাছে কি সব প্রেমপত্র-টত্র লিখেছে, সেগুলো দাও হে!

টুকু তাড়াতাড়ি তপনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, বড়দা, প্লিজ, ওরকম ভাবে বোলো, আমি তাহলে ঠিক মরে যাব।

তপন তার পিঠে হাত রেখে বলল, দূর পাগলি! ওসব কিছু না। বিমান দেখ গিয়ে এখন তোর বিরহে পদ্য লিখছে-চিঠি দেখানোর মতন নোংরা কাজ ছেলেরা করে না। নে, মন খারাপ করিস না, কিছু যদি হয়ই, আমি ম্যানেজ করে দেব। নে, সিগারেট খাবি? খা না একটান!

টুকু চোখ গোল গোল করে বলল, তুমি আমাকে সিগারেট খেতে বলছ?

হ্যাঁ। খা না একটান। মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখলে আমার বেশ লাগে। তুই আগে খেয়েছিস নাকি?

হ্যাঁ, ও-ই তো আমায় খাইয়েছে?

মানে? বিমান?

তপন আবার প্রচন্ড হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, দেখিস একথা ভুল করে যেন তোর বরকে বলে ফেলিসনি!

তপন বেশিরভাগ সময় ঠাকুমার সঙ্গেই গল্প করে। ঠাকুমার এখন আর একটাও দাঁত নেই, তবু সেই ফোকলা মুখে হাসিটাও সুন্দর দেখায়। এবাড়িতে শুধু ঠাকুমার কথাতেই এখনও বাঙাল টান আছে। ঠাকুমার ধারণা, তপন এত উন্নতি করেছে বিদেশে সে যেন কোনো একটা রাজ্যের রাজা হয়ে গেছে।

ঠাকুমা হাসতে হাসতে বলেন, আমি তো ভাবছিলুম, ভাই, তুই একটা মেম বিয়ে করে আনবি! মরার আগে আমার নাত-বউকে আশীর্বাদ করে যাব।

তপন বলল, বলো কী ঠাকুমা, ওই বেড়াল-মুখো মেম বিয়ে করব! সেই মেমবউ কি আমার এই বুড়িকে খাতির করত।

আহা, তা কেন হবে রে! মেম কি ভালো হয় না! তাও হয়। ওই তো আমাদের উকিলবাবুর ছেলে পরেশ মেম বিয়ে করেছিল। কী ভালো মেয়েটি! সাত সমুদুরের পারে থাকিস, সেখানে আর অন্য মেয়ে পাবি কোথায়?

না, বুড়ি, সেখানে অন্য অনেক জাতের মেয়ে আছে। বাঙালিও আছে।

তাহলে তাদেরই একটাকে বিয়ে কর না! ওখানে তোকে রান্নাবান্না করে দেয় কে?

নিজেই রান্না করি। খুব ভালো শিখে গেছি এখন!

ঠাকুমা হঠাৎ চোখের জল মোছেন। কোঁচকানো মুখের চামড়া বেয়ে জল গড়ায়, ঠাকুমা ভাঙা গলায় বলেন, তুই এত উন্নতি করলি কিন্তু তোর মা দেখে যেতে পারল না–কত আনন্দ করত সে আজ–সারাজীবন দুঃখ পেয়েছে–আজ এমন রাজার মতন ছেলে তার–বড়ো কাঁদত শেষ দিকে।

নিজের দুই মৃত ছেলে কিংবা স্বামীর কথা উচ্চারণ করলেন না একবারও, শুধু তপনের মা-র কথা বলে কাঁদতে লাগলেন! তপন স্থিরভাবে বসে রইল। সবাই তো দুঃখ পেয়ে গেছে। তাদের পরিবারে-জ্যাঠামশাই বাবার কথা তো বাদই, ঠাকুরদাও বলতে গেলে

প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেছেন টি বি-তে। সারাজীবনভরা শুধু দুঃখ আর দুঃখ। একমাত্র ছোটোকাকাই এখন বেশ গুছিয়ে বসেছেন। কিন্তু তার মায়ের দুঃখটাই বেশি করে মনে পড়ছে ঠাকুমার।

তপন বলল, মা কাঁদত? কিন্তু আমি যখন বিদেশে যাই, তখন তো মা খুশি হয়েই রাজি হয়েছিলেন। মা রাজি না হলে কি আমি যেতাম?

রাজি হবে না কেন! তুই বড়ো হবি, উন্নতি করবি-কত আনন্দের কথা, কিন্তু তবু চক্ষে না দেখলে বুকটা পোড়ায়, আর তো কেউ নেই-একটামাত্র ছেলে, আমি তাকে কত বোঝাতাম, ওলো, তোর ছেলে ভালো আছে, আমি জানি ভালো আছে।

ঠাকুমা তাঁর একটা অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা বললেন তপনকে। তপন যখন মাসের পর মাস চিঠি লেখেনি-তখনও ঠাকুমা তার জন্য চিন্তিত হননি। ঠাকুমা নাকি চোখ বুজে তাকে দেখতে পেতেন। বেশ জোর দিয়ে ঠাকুমা বললেন, যখনই ওরা চিন্তা করত তোর জন্য, আমি চোখ বুজে ঠাকুরকে ডাকতাম। অমনি ঠাকুর আমায় দেখিয়ে দিতেন। আমি স্পষ্ট দেখতাম তুই ঠিক সময়ে হেঁটে হেঁটে অফিসে যাচ্ছিস কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিস, আমি সেকথা ওদের বলতাম। আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলতাম, ঠাকুর, তুমি আমাদের ওই ছেলেটাকে দেখো। ওর মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, বিদেশ-বিভূয়ে, তুমি যদি ওকে না দেখো তা হলে আর কে দেখবে। ওর মা বড়ো দুঃখ পেয়ে মরেছে, মরার পর যেন ছেলের ভালো খবর জেনে একটু শান্তি পায়!

একথা শুনে তপন ঘাড় হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এ-রকম কথার কোনো উত্তর হয় না। একটু বাদে আস্তে আস্তে বলে, ঠাকুমা, আমার ওপর তোমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না?

কেন রে, রাগ হবে কেন?

যে সাহেবরা তোমার দুই ছেলেকে মেরেছে সেই সাহেবদের দেশে আমি ভিখিরির মতো পড়ে আছি!

ঠাকুমার সমস্ত আকৃতিই হঠাৎ বদলে গেল, সোজা হয়ে বসলেন, ঘষা কাচের মতন চোখ দুটোও যেন বারেক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন, ওকথা বলিসনি তপু, ওসব কথা আর মনে রাখতে নেই। ওসব পুরোনো কথা আর কক্ষনো ভাববি না– তখন দিনকাল ছিল আলাদা–মানুষের ওপর রাগ রাখতে নেই, আয়, এদিকে আয়, আমার গা ছুঁয়ে বল, ওসব ভাববি না আর।

তপন এগিয়ে এসে ঠাকুমার গায়ে হাত রাখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ঠাকুমা একটা অদ্ভুত কথা শুনবে? বিলেতে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সম্পূর্ণ কাহিনিটা ঠাকুমাকে বলল তপন, শুনতে শুনতে ঠাকুমার চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়তে লাগল। রীতিমতো ফুঁপিয়ে উঠে তিনি বললেন, আহা, কেন অত কষ্ট দিয়েছিস ওকে। কেন, তাকে নিয়ে এলি না, আমি তাকে আশীর্বাদ করতাম! আহা, সে হতভাগীও তো কত কষ্ট পেয়েছে জীবনে–তার তো কোনো দোষ নেই রে।

তপন ভাবতেই পারেনি, ঠাকুমা এ-রকম কথা বলবেন। ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন যদিও, কিন্তু কখনো বাড়ির বাইরে বেরোননি, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, সব দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজেছেন শুধু রামায়ণ-মহাভারতে, সেই ঠাকুমাও যে এমন সংস্কার মুক্ত হতে পারবেন, তপন কল্পনাই করেনি। কঠিন দুঃখ বুঝি মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়, অনেক মহত্ত্বের স্তরে নিয়ে যায়।

ঠাকুমা বললেন, তারও তো বাপ মরেছে, সে তো রাগ পুষে রাখেনি, সে ভুলতে পেরেছে, আর তুই পারলি না? তুই তার কাছে হেরে গেলি?

কী করব, ঠাকুমা, ব্যাপারটা যেই জানতে পারলাম, তখন থেকেই আমার শরীর যে রাগে জ্বলতে লাগল। আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। তা ছাড়া ওদের জাতটার

ওপরেই আমার রাগ। ওদের জাত এখনও অনুতাপ করে না, এখনও আমাদের ঘেন্না করে। তাই আমিও ওদের ঘেন্না করি।

কিন্তু মেয়েটা তো তোকে ঘেন্না করেনি! তুই যদি তাকে বিয়ে করতিস, তাহলে তোদের যে ছেলেপুলে হত, তারা কোনো জাতকে ঘেন্না করত না। তাদের কোনো রাগ থাকত না!

থামো ঠাকুমা, ওকথা আর বোলো না।

.

টুকুর বিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটেই হয়ে গেল। কাকা প্রচুর টাকা খরচ করলেন মেয়ের বিয়েতে, আলোর মালা, সানাই কিছুই বাদ যায়নি। প্রায় হাজার দেড়েক লোকের নেমন্তন্ন। সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এজন্য কাকার মুখে আজকাল বেশ-একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠেছে। তবু কাকা একবার কেঁদে ফেলেছিলেন। মেয়েকে সম্প্রদান করার সময় পুরুত যখন কাকাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের নাম বলতে বললেন, তখন কাকা তাঁর নিজের বাবার নামটা বলেই হঠাৎ মুখ নীচু করে উত্তরীয়তে চোখ মুছলেন।

টুকুও একবার কেঁদেছিল। দারুণ জমকালো সাজে, বেনারসি আর গয়নায় মুড়ে, বিয়ে আরম্ভ হবার আগে একটা ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে। ঘর ভরতি মেয়ে, নিমন্ত্রিতরা তাকে দেখে উপহার দিয়ে যাচ্ছে, মিষ্টি হাসি দিয়ে হাত পেতে সেগুলো নিচ্ছিল টুকু। বিয়ের লগ্ন মধ্য রাতে। একসময় তপনকে দেখে টুকু উঠে দাঁড়াল, সামনের মেয়েদের বলল, এতক্ষণ চেয়ারে বসে থেকে থেকে পা ধরে গেছে! একটু দাঁড়াই! তপনকে জানলার পাশে এনে টুকু ফিসফিস করে বলল, বড়দা আর কিছু বলল না, শুধু তপনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তপন বুঝতে পারল ওর চোখের ভাষা। তপন হাসতে হাসতেই ফিসফিস করে বলল, ভয় নেই, কিছু ভয় নেই, বিমান আসেইনি নেমন্তন্ন খেতে! এত রাত হয়ে গেছে, আর আসবে না।

সেই কথা শুনে অকস্মাৎ টুকুর চোখে জল এসে গেল। ভয়ের ছায়ামাত্র নেই মুখে। জলভরা চোখে জানলার বাইরে দূরের অন্ধকারের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকেই আবার নিজেকে সামলে নিল!

বাংলার মফসসলের মেয়ে, নিজে কী চায়, তাই-ই জানে না। একটু বাদেই সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে, চলে যাবে অচেনা জায়গায় শ্বশুরবাড়ি। তপনের মনে হল, টুকু শেষপর্যন্ত ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখেই ঘর করবে। শুধু একটা ছোট্ট কাঁটা বিঁধে থাকবে মনের মধ্যে। মাঝে মাঝে মনে পড়বে, বিমান নামে একটি ছেলে ওকে ভালোবেসেছিল, সেও ভালোবেসেছিল বিমানকে, কিন্তু সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য দেয়নি। সে বিমানের কাছে কথা রাখেনি।

.

১২.

আমি জানতাম, তুমি ফিরে আসবে।

কী করে জানতে?

আমি জানতাম, তুমি আমাকে দুঃখ দেবার জন্য ফিরে আসবে।

অ্যালিস, তুমি কী বিশ্বাস করবে, আমি নিজেও দুঃখ পেয়েছি অনেক।

তাও জানতাম, দুঃখকে চাপা দেবার জন্যই তো তুমি অত বেশি রাগ দেখাচ্ছিলে।

অ্যালিস, তুমি আমার ওপর দারুণ প্রতিশোধ নিয়েছ। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলতে চেয়েছিলাম, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি প্রতি রাত্রে ফিরে এসেছ স্বপ্নে। আমার ঘুম খুব গাঢ়, সাধারণত আমি বেশি স্বপ্ন দেখি না, কিন্তু গত একমাস

ধরে তুমি স্বপ্নে এসে দাঁড়াচ্ছিলে আমার কাছে, তোমার মুখে কোনো রাগের চিহ্ন নেই- যেন আর একটা কী কথা বাকি থেকে গেছে।

টপন, আমি তোমাকে ওরকমভাবে স্বপ্ন দেখিনি, জাগ্রত অবস্থাতেই তোমার কথা ভেবেছি। অনেক ভেবেছি, ভেবে বুঝতে পেরেছি তোমার আমার দু-জনের সঠিক সত্য।

সেটা কী? তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

টপন, তুমি চা খাবে, না কফি? আমার কাছে কোনো ড্রিংকস নেই।

না, এই সকাল বেলাতেই আমি মদ খেতে চাই না। আমি চা কফিও কিছু খাব না।

তুমি ব্রেকফার্স্ট সেরে এসেছ? খাও-না কিছু? কফির জল বসানোই আছে।

না, আমার কিছু লাগবে না। তুমি বোসো, আমার কথাটার উত্তর দাও।

দাঁড়াও, হিটারে কফি-পট চাপানো আছে নামিয়ে আসি।

আবার লণ্ডনে ফিরে হিথরো বিমান বন্দর থেকেই তপন ফোন করেছিল অ্যালিসকে। তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। কিন্তু তপন জানে অ্যালিস খুব ভোরেই ঘুম থেকে ওঠে। টেলিফোন বেজে উঠলে ল্যাণ্ডলেডি শুনতে পাবার আগে অ্যালিসই এসে ফোন ধরবে। অ্যালিসের গলা শুনেই তপন বলেছিল, অ্যালিস, আমি ফিরে এসেছি, আমি একটু বাদেই তোমার বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি বাড়িতে থেকো, আজ আর অফিসে যেয়ো না।

অ্যালিসের কণ্ঠস্বর একটু নিরুত্তাপ, একটু সংযত, সে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? কবে ফিরেছ?

এই মাত্র। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করছি। হোটেল ডোমিনিক-এ আমার রিজার্ভেশান আছে, ওখানে প্রথম গিয়ে আমার মালপত্র রেখেই তোমার বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি থাকবে তো?

কথা বলার সময় কিছুটা শঙ্কা ও উত্তেজনায় তপন ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। এতখানি জোর দিয়ে সে অ্যালিসের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু সে অধিকার কি তার আছে? অ্যালিসের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার সে করেছে, তাতে অ্যালিস যদি এখন কথার মাঝখানে টেলিফোন নামিয়ে রাখে কিংবা তাকে বিদ্রূপ করে কিছু বলে ওঠে। অ্যালিস তা অবশ্য করল না, কিন্তু প্রবল কোনো উচ্ছ্বাসও দেখাল না, শান্ত গলায় বলল, তুমি এক্ষুনি ফিরলে, এবেলা হোটেলে বিশ্রাম করে নাও, বিকেলে দেখা হবে।

তপন নিজেই অ্যালিসকে আগেরবার বলেছিল, আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, কিন্তু এখন বলল, না, বিকেলে নয়, এখন বাজে ছ-টা পনেরো, আমি ন-টার মধ্যে তোমার বাড়িতে পৌঁছোব। তুমি ব্রেকফার্স্ট খেয়ে নিয়ে, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না।

-কিন্তু, আমার অফিস।

তপন অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিল, আজ অফিসে যাবে না তুমি। যেন তপনই অ্যালিসের অফিসের বড়ো সাহেব, সে অ্যালিসকে ছুটি নেবার হুকুম দিচ্ছে।

কলকাতা থেকে ভিসার ওপর নতুন স্ট্যাম্প মারিয়ে আনেনি বলে খানিকটা অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু তপনের দেরি সইছিল না আর, তাড়াতাড়ি পাঁচ দিনের ট্রানজিট ভিসা করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। এয়ার টার্মিনাল পর্যন্ত বাসেই যেতে পারত, তা গেল না, ওখান থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এল হোটেলে। দ্রুত দাড়ি কামিয়ে পোশাক পালটে তক্ষুনি অ্যালিসের অ্যাপার্টমেন্টে।

অ্যালিস ফিরে এসে আবার বসল। পুরোনো কোনো কথাই তুলল না। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছিলে, কেমন লাগল বলো!

তপন সূক্ষ্ম চোখে অ্যালিসের সর্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখল, অ্যালিস সামান্য একটু রোগা হয়েছে এই ক-দিনে। মুখে ফুটে উঠেছে একটা করুণ উদাসীনতা। তপনের টেলিফোন

পাবার পরও অ্যালিস বাইরে যাবার পোশাক পরে নিয়েছে, চুল আঁচড়ানো থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রসাধন শেষ, এমনকী মোজা এবং দস্তানাও বাদ রাখেনি, অ্যালিসকে বোধ হয় অফিসে যেতেই হবে। আগেরবার, এমন সকালে তপন অ্যালিসকে ফোন করলে অ্যালিস হয়তো বিছানা ছেড়ে উঠতই না, বিছানায় শুয়ে শুয়েই তপনকে অভ্যর্থনা জানাত। আলস্যে শরীর মুচড়ে বলত, কাম ডার্লিং, গিভ মি আ কিস ফর ব্রেকফার্স্ট। তপন অবশ্য এবার সেরকম ব্যবহার আশাও করেনি, বড় নিষ্ঠুর, বড়ো আনশিভালরাস ব্যবহার করেছিল সে অ্যালিসের সঙ্গে।

তপন মৃদু গলায় বলল, অ্যালিস তুমি আমার ওপর এখনও খুব রাগ করে আছ, না?

উত্তর না দিয়ে অ্যালিস একটু হাসল। তপন এবার দেয়ালের দিকে চেয়ে বলল, সেই ছবিটা কোথায়?

নেই। নষ্ট করে ফেলেছি!

একেবারে নষ্ট করে ফেললে? কেন?

আমার ঘরের ইনটিরিয়ার ডেকরেশনের সঙ্গে মানাচ্ছিল না। তুমি লক্ষ করনি, আমি পর্দার রং, বেডকভার সব পালটে ফেলেছি? কেমন হয়েছে, বলো!

তুমি কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। ছবিটা নষ্ট করে ফেললে কেন?

সত্যি কথা বলব? ঝোঁকের মাথায়। এখন অবশ্য একটু একটু অনুতাপ হচ্ছে–একটা পুরোনো নির্দোষ ছবি–একেবারে নষ্ট করে ফেলার কোনো মানে হয় না।

তপন মুখে বলল, নিশ্চয়ই! কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না অ্যালিস কী বোঝাতে চাইছে। সে নিজেও অ্যালিসকে কী বলবে, ঠিক বুঝতে পারছে না। খাবার টেবিলের দু-পাশে দুটো চেয়ারে বসেছে ওরা–এখন পর্যন্ত তপন একবারও অ্যালিসকে স্পর্শ করেনি। তার বুকের

মধ্যে মাঝে মাঝে আকুলি-বিকুলি করে উঠেছে অ্যালিসের মাথাটা তার বুকে টেনে নেবার, কিন্তু ঠিক মুহূর্তটা খুঁজে পাচ্ছে না।

অ্যালিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব আনুষ্ঠানিকভাবে?

না, টপন, ক্ষমা চাওয়া তোমাকে মানায় না। তোমার রাগী নিষ্ঠুর স্বভাবই বেশি মানায়!

আমাকে ব্যঙ্গ করছ?

না, সত্যি বলছি। রাগলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায়! টপন, এবার তুমি লণ্ডনে কতদিন থাকবে?

তুমি যখন জানতেই যে আমি ফিরে আসব, তখন এটাও জানতে পারনি, আবার এসে আমি কতদিন থাকব?

না, তুমিই বলো।

আমি দু-দিনের ট্রানজিট ভিসা নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে করলে অবশ্য বাড়ানো যায়।

বাড়াবে।

সেটা নির্ভর করছে–অ্যালিস, আজ বাইরে খুব সুন্দর রোদ উঠেছে, চলো আমরা বেড়াতে বেরোই। কোথাও লাঞ্চ খেয়ে নেব, তোমাকে আমার ক-টা কথা বলার আছে।

অ্যালিস সামান্য হেসে, বলল, না, আজ বেড়াতে যাব না। কী বলবে, এখানেই বলো।

হঠাৎ তপনের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, তার মনে পড়ল আর একটি সকালের কথা। অ্যালিস এসেছিল তার হোটেলে, অ্যালিস বলেছিল, তপনকে তার কিছু বলার আছে। তপন গ্রাহ্য করেনি, নিষ্ঠুরভাবে হোটেলের বারোয়ারি লবি দেখিয়ে বলেছিল, কী বলবে

এখানেই বলো না! অ্যালিস কি আজ তার শোধ নিচ্ছে? সেই অ্যালিস, যে বলেছিল, তপনকে ভালো না বেসে তার আর উপায় নেই! দুঃখ পাবার বদলে তপন একটু রেগে উঠল। ঝাঁঝালো বলায় বলল, তোমাকে বুঝি আজ অফিস যেতেই হবে? না গেলে চলে না?

তা না গেলেও চলে একদিন। একদিন তো আমার অসুখ করতে পারে।

কিন্তু অফিস যাবার জন্য তো পোশাক পরে তৈরি হয়েই আছ?

অফিস যাবার জন্য পোশাক পরিনি!

তবে? অন্য কেউ আসবে? আর কারুর সঙ্গে বেরোবে? ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আগে বললেই পারতে!

না, অন্য কেউ আসবে না। আমি পোশাক পরে রয়েছি, তার কারণ তুমি যাতে ঘরে ঢুকেই একটা জিনিস দেখতে না পাও!

কী দেখতে পাব? আমি আর কিছু দেখতে আসিনি, আমি শুধু তোমাকেই দেখতে এসেছি।

টপন, তোমাকে আমার একটা সংবাদ দেবার আছে।

অ্যালিস আস্তে আস্তে বাঁ-হাতের দস্তানাটা খুলল। হাতখানা তপনের মুখের সামনে এনে বলল, এই যে, দেখো! অ্যালিসের অনামিকায় একটা মুক্তো বসানো আংটি।

ওই আংটির মর্মার্থ তপন জানে, তবু এখন তার খেয়াল হল না, বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল কি দেখব? আংটি? কীসের? বলতে বলতেই তপনের মনে পড়ে গেল! যেন সে ভয়ংকর একটা খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, একটুর জন্য সামলে উঠল। মুখে তৎক্ষণাৎ হাসি ফুটিয়ে বলল, আরে তাই নাকি! কবে হল? কনগ্রাচুলেশানস! কার সঙ্গে? হু ইজ দা লাকি ফেলো?

অ্যালিস বিনা উত্তেজনায় বলল, এখনও হয়নি, আমার বিয়ের তারিখ এই শনিবার। তুমি যদি ততদিন থাকো, তোমাকে নেমন্তন্ন করছি।

কে? কে সেই ভাগ্যবান?

ডনাল্ড। ডনাল্ড স্মার্ট, হয়তো তোমার মনে আছে।

তপনের মনে পড়ল, অ্যালিসেরই অফিসের এক ছোকরা- কেনসিংটনে একদিন অ্যালিসের সঙ্গে বেড়াবার সময় দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। ছেলেটি এমনভাবে তপনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, যেন অ্যালিস একজন ইণ্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে ঘুরছে সে বিশ্বাসই করতে পারে না। সেদিন অ্যালিস বলেছিল, ডনাল্ডের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, ওর সঙ্গে আমি কথা বলার বিষয় খুঁজে পাই না।

খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল, তাই না?

না, ডনাল্ড তো অনেকদিন থেকেই এ-রকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, আমিই শুধু-কিন্তু আমি দেখলাম, আমি বড়ো দুর্বল, আমার পক্ষে একা বাঁচা সম্ভব নয়-আমার একটা কিছু অবলম্বন চাই- জীবনে আমি তো কখনো স্নেহ-ভালোবাসা পাইনি কারুর, কিন্তু এখন একটু পাবার জন্য

অ্যালিস, আমি আশা করি ডনাল্ডের সঙ্গে তোমার জীবন খুব সুখী হবে।

ধন্যবাদ, টপন–

অ্যালিস, তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?

বলো।

-তুমি একটু আগে বলেছিলে, তুমি আমাদের দুজনের একটা সঠিক সত্য খুঁজে পেয়েছ, সেটা কী? আমি যদিও নিশ্চিত জানতাম, তুমি আবার ফিরে আসবে। কিন্তু আমি বুঝতে

পেরেছি, তোমার আমার ভালোবাসা অসার্থক হতে বাধ্য। তুমি তো শুধু আমার বাবাকে ঘৃণা করনি, তুমি ঘৃণা করেছ আমার জাতিকে-যে জাতই আসলে তোমার পিতার হত্যাকারী, যে জাতের অধীনে তোমরা ছিলে।

না, অ্যালিস, শোনো।

আমাকে আগে বলতে দাও। তুমি আর আমি পরস্পর ঘৃণা ভুলতে পারি-কিন্তু যতদিন দুটো দেশ অনেক কাছাকাছি আসে, সমান ভিত্তিতে আসে, ততদিন দু-দেশের মানুষের মিল হতে পারে না। সেসময় এখনও আসেনি-এখন আমরা দু-জন কাছাকাছি এলেও অনেক কমপ্লেক্স তোমাকে-আমাকে ঘিরে থাকবে।

না অ্যালিস, ভুল! আমি দেশ মানি না, জাত মানি না, তুমি তো জানো।

তুমিই তো বলেছিলে, আর সব ভোলা গেলেও, শিরায় শিরায় যে রক্ত, সে কিছু ভোলে না।

আমি রক্ত মানি না।

হ্যাঁ মান, তুমি এখন উত্তেজনায় বলছ।

না, না, আমার কোনো দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, আমি একজন মানুষ শুধু।

টপন, পৃথিবীতে গাছপালার মতন মানুষও শিকড় ছাড়া বাঁচতে পারে না।

তপন কী করবে, সে কি হাঁটু মুড়ে বসে অ্যালিসের জানু ধরে বলবে, হ্যাঁ, অ্যালিস, মানুষ তাও পারে। তুমি ওই আংটি ছুঁড়ে ফেলে দাও! চলো, আমরা এমন একটা দেশে যাই, যেখানে তোমার-আমার দু-জনের জাতই অবান্তর। অ্যালিস, তুমিই বলেছিলে, তুমি আমাকে যেমন ভালোবেসেছ, সেরকম আর কারুকে কখনো ভালোবাসনি! সেই ভালোবাসা কেন মিথ্যে করবে! আমিও অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু আর কারুর

জন্য আমার বুক এমন কাঁপেনি, আর কেউ আমার স্বপ্নে এমন বারবার এসে দাঁড়ায়নি। অ্যালিস, আমিও ভালোবাসার জন্য কাতর।

কিন্তু তপন সেসব কিছুই করল না। তার অহংকার তাকে কখনো কারুর কাছে হাঁটু মুড়ে বসায়নি। কাতরভাবে ভালোবাসার কথা বলতেও সে জানে না। তপন অদ্ভুত ধরনের একটু হাসল শুধু। তারপর বলল, যাক এখন আর এসব কথা আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। ইটস অল ওভার, ইজনট ইট? অ্যালিস, আমি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই।

অ্যালিসকে টেলিফোন করেছে কে যেন। অ্যালিস বারান্দায় টেলিফোন ধরতে গেল। তপন চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখল। ছবিটা নেই, তবু দেয়ালের সেই জায়গাটাতে একটা চৌকো সাদা দাগ রয়েছে। তপন যদি কখনো এ ঘরে না আসত–।

অ্যালিস ফিরে এসে বলল, ডনাল্ড ফোন করেছিল। আমি অফিসে এখনও পৌঁছোয়নি তো, তাই চিন্তা করছে।

তপন ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি এখনও যেতে পার অফিসে। একটু দেরি হবে, যদিও বিয়ের পর তো তোমাকে ছুটি নিতেই হবে, শুধু শুধু একটা দিন নষ্ট করবে কেন?

অ্যালিস মৃদু হাস্যে বলল, আমি ডনাল্ডকে বলেছি, আমি আজ অফিসে যাব না।

না, না, একটা দিন শুধু শুধু নষ্ট করবে কেন? আমি যাই অ্যালিস! আমার দু-দিন মাত্র থাকার মেয়াদ, তাই তোমার বিয়েতে থাকতে পারব না। এখনই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তপন সত্যিই বিদায় নিচ্ছে দেখে অ্যালিস তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। অ্যালিসের হাত ধরে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তপন। এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে এখনও সে অ্যালিসকে বুকে টেনে নিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে পারে। কিন্তু অ্যালিসের আঙুলের আংটিতে খোঁচা লাগলো তার। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে তপন বলল, অ্যালিস, তুমি ওই ছবিটা

একেবারে নষ্ট না করলেই পারতে। আসলে, আমি আজ তোমার কাছে এসেছিলাম ওই ছবিটার একটা কপি করিয়ে নিতে। আমার বাবার কোনো ছবি তো আমার কাছে নেই।

অ্যালিস যেন তপনের ওকথাটা শুনতেই পেল না। মুখ নীচু করে আপন মনে বলল, আমি জানতাম, তুমি আমাকে দুঃখ দেবার জন্য আবার ফিরে আসবে।

তপনও যেন অ্যালিসের কথাটা শুনতে পেল না, আপন মনেই বলল, আর কোনোদিন দেখা হবে না, আর কোনোদিন দেখা হবে না, গুড বাই অ্যালিস!

.

ছেলের জ্বর, তাই ললিতা আসতে পারেনি, দিবাকর এয়ারপোর্টে এসেছে তপনকে বিদায় দিতে। মালপত্র জমা দেওয়া হয়ে গেছে, কাস্টমস বেরিয়ারের সামনে দু-বন্ধুতে গল্প করছে। সিগারেট টানতে টানতে। একটু বাদেই প্লেন ছাড়বে। সারাদিন ধরে আজ ঝড়-বৃষ্টি, আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, দিবাকর শেষ মুহূর্তেও তপনকে অনুরোধ করেছিল আর একটা দিন থেকে যেতে। তপন রাজি হয়নি।

দিবাকর জিজ্ঞেস করল, তা হলে কলকাতায় গিয়েও তোর মায়া পড়ল না? একবারও ইচ্ছে হল না দেশেই থেকে যেতে?

তপন হাসতে হাসতে উত্তর দিল, রে মায়া পড়া তো দূরের কথা, কলকাতা আমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলতে পারিস!

ক্যানাডায় বিচ্ছিরি ঠাণ্ডাতেই কাটাবি দু- বছর?

বলা যায় না, চেষ্টা করব অস্ট্রেলিয়ায় যাবার।

অষ্ট্রেলিয়ায় সেখান থেকে আবার অতদূরে আমেরিকায় ফিরবি?

আমেরিকায় আর না ফিরতেও পারি। মনে হচ্ছে, আমরিকাও আর আমার ভালো লাগবে না!

অস্ট্রেলিয়াও তো ভালো লাগবে না। আমি ঠিক জানি! সেখান থেকে তা হলে আবার কোথায় যাবি?

এত বড়ো পৃথিবী, পৃথিবীতে এত মানুষ, এই মানুষের ভিড়েই কোথাও মিশে থাকব।

দিবাকর হো-হো করে হেসে বলল, কী রে, একথাটা কি একটু কবিত্ব কবিত্ব হয়ে যাচ্ছে না?

তপন লজ্জা পেয়ে বলল, যাঃ, মোটেই না। তাহলে, এইভাবে বলছি, যতদিন বেঁচে থাকব, কোথাও-না-কোথাও থাকব!

দিবাকর তপনের কাঁধ ছুঁয়ে বলল, না, তা নয়, আমি তোকে আসল কথা বলছি শুনে রাখ! তুই কোথাও টিকতে পারবি না! তুই কোনো জিনিসই সহজভাবে মেনে নিতে পারিস না! তোকে আবার দেশেই ফিরতে হবে।

তপন বলল, না।

দিবাকর বলল, আমি যা বললুম। দেখিস মেলে কি না।